ওয়ান্ডুর বিচে সূর্যাস্ত, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ - আলোকচিত্রী- পর্ণা সাহানা

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

~ ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা - শ্রাবণ ১৪২৪ ~

"যাবে তো যাও নীলপাহাড়ি

সেথায় নড়ে সবুজ দাড়ি..."

- তা পথে নীলপাহাড়ি দেখলাম, রংলি রংলিওট চা বাগানও।তবে সবুজ দাড়িটাড়ি বাপু চোখে পড়েনি। বদলে পাহাড়ের ঢালে একটা নীল-সবুজ ঝলমলে ময়ূর।

বুদ্ধ পূর্ণিমা। পথে স্থানীয় মানুষের ঢল - উৎসবের আমেজ চা বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ছোট-বড় গুম্ফাগুলির আশপাশে। গন্তব্যে পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে গেল। জিনিসপত্র নামিয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। পায়ে পায়ে অনেকটা পাহাড়ি বনপথে নেমে গিয়ে ছোট্ট একটা গুম্ফায় পৌঁছাই। পাঁচদিন ধরে চলা অনুষ্ঠান, পুজো-আচ্চা তো শেষ। নামতে নামতেই দেখছিলাম বিরাট সব ড্রাম, শিঙা নিয়ে উঠে আসছেন লোকজনেরা। আবছা অন্ধকার গুম্ফায় জ্বালানো হালকা আলোয় চমৎকার একটা পারিবারিক পরিবেশ ধরা দিল চোখে। ছোট্ট একটা শিশু হামা টানছে। তার মা আমাদের বসতে বলে গরম গরম তিন কাপ চা এনে দিলেন। কী যে ভালো লাগল। সারাদিনের ক্লান্তি অনেকটা জুড়িয়ে গেল। গুম্ফায় আরও কয়েকজন পুরুষ রয়েছেন, লামা-পুরোহিত ছাড়াও। ফুল গুছাতে গুছাতে গল্প করছিলেন মহিলা – এই গুম্ফাটা তাঁদের পারিবারিক। পাহাড়ের আরও নীচে বাড়ি। এবার গুম্ফা বন্ধ করে বাড়ি ফিরে রান্না বসাতে হবে। লামা-পুরোহিতের ইঙ্গিতে প্রসাদ দেন হাতে হাতে। লোডশেডিং হয়ে যায়। ওদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে সন্ধ্যা নামছে ঝুপ ঝুপ করে।

ফেরার পথে অন্ধকার হয়ে আসে। নিস্তব্ধ রাত্তিরে কুকুরের ডাক ছিল বটে, তবে কক্ষনো হাঁড়িচাচায় গান ধরেনি। আর হোমস্টে-এর মাথায় পূর্ণিমার চমৎকার চাঁদের গা দিয়ে কালো মেঘ ভেসে যাওয়ায় যখন সাইকো সিনেমার একটা শট মনে পড়ছিল, কন্যা আর আমি ওয়্যারউলফের ডাক ডাকার একটা চেষ্টা করছিলাম জোরসে।

রাত্তিরে খেয়ে ওঠার সময় সিঁড়িতে কী একটা ভয়ানক ঠক ঠক করছিল ঠিকই, কিন্তু গোটা হোমস্টেতে অতিথি বলতে সেদিন রাতে শুধু আমরা তিনজন থাকলেও কুম্ভুমশাই মোটেও মুণ্ডু নাচাতে আসেননি। সেটা মেসির জন্য কিনা তা অবশ্য বলতে পারব না।

ওমা, মেসি কে তাও বলিনি বুঝি! বাদামী রঙের মস্ত বড় আদুরে কুকুরটা। ওই ওদেরই পোষ্য। অন্ধকার রাত্তিরে যখন দূরের পাহাড়ের গায়ে জ্বলে থাকা আলোগুলো দেখছিলাম দুজনে, সে চুপ করে শুয়ে ছিল আমাদের পায়ের কাছে। তারপর সারারাত ঘরের সামনে পাহারায় থাকল।

সকালে তুমুল বৃষ্টি। বেড়াতে গেলেই ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যায়। চাদর জড়িয়ে দরজার সামনেটায় চেয়ার টেনে বসি। হাতে সিলভিয়া প্ল্যাথের আনঅ্যাবরিজড জার্নাল। পড়ি তাঁর ছেলেবেলার সুখ-দুখের কথা। মাঝে মাঝে সামনে তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ।

বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গেছে দিগন্ত, পাহাড়, পাইন গাছের সারি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন একটা ঘোর লেগে যায় যেন। বৃষ্টি থামতে দুজনে বেরিয়ে পড়ি। চা বাগান আর পাইন গাছের ভেতর দিয়ে পাকদণ্ডী বেয়ে ঘুরে এলাম পায়ে হেঁটে। হ্যাঁ, মেসিই তো পথ দেখিয়ে শর্টকাট চিনিয়ে নিয়ে এল।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা দিল না, তা হোক, সত্যিই তিনচুলে বেশ ফাইন।

মেয়ের আই এস সি পরীক্ষার পর বেড়াতে গিয়েছিলাম তিনজনে। ফিরে এসে বড্ড শরীর খারাপ হল, টানা অনেকদিন ধরে। মাঝে তো 'আমাদের ছুটি' বেরোনোই অনিশ্চিত হয়ে উঠছিল। শেষপর্যন্ত হল, কিন্তু ধারাবাহিক লাদাখ পর্বের এবারের চিঠিটা লিখে উঠতে পারলাম না। তার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

বৃষ্টির দিনগুলো ভালো কাটুক আপনাদের। সবুজ হোক, সজল হোক। আর যাঁদের কাটছে কষ্টে – প্রকৃতির খামখেয়ালে নাকি অপরিকল্পিত উন্নয়নের কল্যাণে - তাঁদের সে দিন পেরোক। উৎসবের মরসুম আসছে, আনন্দে কাটুক সকলের।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

- দময়ন্তী দাশগুপ্তের ধারাবাহিক 'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব'- এর চতুর্থ পত্র অনিবার্য কারণে প্রকাশিত হল না। পরবর্তী সংখ্যায় যথারীতি প্রকাশ করা হবে।

~ আরশিনগর ~

মানভূমের পথে-প্রান্তরে – ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

~ সব পেয়েছির দেশ ~

কালাপানির অন্দরমহলে - পর্ণা সাহানা

ঘাটশিলার জঙ্গল-পাহাড়ে - তপন পাল

আমাদের ছুটি - ২৪শ সংখ্যা

পলকাটা হিরে - ওরছা
- অভিজিৎ কুমার চ্যাটার্জি

নীল পাহাড়, অর্কিড আর আত্মঘাতী
পাখিদের দেশে - সুদীপা দাস ভট্টাচার্য্য

ইতিহাসের মেবারে - হিমাদ্রি শেখর দত্ত

~ ভুবনডাঙা ~

বেঁচে ওঠা ল্যাং টাং-এ - সৌম্যদীপ হালদার

এবার ভুটান - দেবাশিস বসু

~ শেষ পাতা ~

মুন্নারের মায়ায় – দেবতোষ ভট্টাচার্য

ক্ষণিকের অতিথি – সৌম্য প্রতীক মুখোপাধ্যায়

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

মানভূমের পথে-প্রান্তরে

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

~ মানভূমের আরও ছবি ~

সেই কৈশোর থেকেই 'পুরুলিয়া' আর 'মানভূম' শব্দদুটি শুনলেই নানান নাদেখা ইতিহাসের ছবি ভেসে আসত। আমার পিসতুতো দাদা অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মানভূম আঞ্চলিক ভাষার এক অগ্রগণ্য কবি, পুরুলিয়ার মাটি ও মানুষের আপনজন। তাঁর কবিতায় জেনেছিলাম ওদেরই ভাষায় প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণার কথা -

"ত আইজ্ঞা উ গুলান কি বটে ... ছবি ত লয় ... লিখা বটে / ত কি লিখলেন বাবু / ই গাঁয়ের বিত্তান্ত কিছু লিখলেন ন কি / ইখেনে একটাও কুয়া নাই জোড়ের জল শুঁকাই গেইছে / একবেলা টুকচেক পান্তা খাইয়ে পাথর ভাঙ্গা মিশিনে খাইটছে ঘরের বিটি ছিলা / আমি বিনা লাঙ্গলের চাষি / ঠিকাদারের নাম কাটা মজুর / চদুর পারা ভালছি আংরাপুড়া আকাশ / মরা কাড়ার চামের পারা শুখা মাটি..."

আর মনে এসে যায় ষাট বছর আগের মানভূমের প্রান্তিক মানুষের ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরোধিতায় উত্তাল দিনগুলোর কৈশোর-স্মৃতি। স্মৃতি মানে ইতিহাস - তখনকার সংবাদপত্র প্রতিবেদন, অতুল ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তাল সংগ্রাম। যার জেরে বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল মানভূমের বঙ্গভূক্তি ও পুরুলিয়া জেলার জন্ম ১৯৫৬-র ১ নভেম্বর। বিনিময়ে অবশ্য বাংলার ধানবাদ চলে গেল বিহারে।

বড় সাধ ছিল তখন থেকেই, বাংলার একদম প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়ার রুখা-সুখা মাটিতে পা রাখার। হয়নি, আমার দীর্ঘকালের প্রবাসযাপনের জন্য। বছর পনেরো আগে একবার দু'দিনের জন্য অযোধ্যা পাহাড়ে গিয়েছিলাম। আবার ঘুরে এলাম পুরুলিয়া অতি সম্প্রতি। 'ডেস্টিনেশন পুরুলিয়া' - কিন্তু ট্রেনে নয়, এবার গেলাম বাসে নিজেদেরই তৈরি করা রুটে প্যাকেজ ট্যুরের কায়দায় - দুর্গাপুর, বর্ধমান, আসানসোল, বাঁকুড়া ছুঁয়ে। ভ্রমণ গন্তব্যে অতএব ছিল বিহারীনাথ, বড়ন্তী, কল্যাণেশ্বরী, মাইথন, পাঞ্চেত ঘুরে গড় পঞ্চকোট, জয়চন্ডী পাহাড়, বাঘমুন্ডি, ছৌ-গ্রাম চড়িদা হয়ে শহর পুরুলিয়া। এই ছিল আমাদের তিনদিনের ভ্রমণ-গন্তব্য। সংশয় নেই, বেশ কঠিন ও শ্রমসাধ্য ঘোরাঘুরি। বিশেষত আমরা পঞ্চাশজন ভ্রমণার্থীর সবাই-ই ছিলাম ষাটোর্ধ এবং আমার মত কয়েকজন সত্তরোর্ধ।

বাঁকুড়া জেলার 'বিহারীনাথ' দিয়েই শুরু আমার 'গন্তব্য পুরুলিয়া।' বাঁকুড়া শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার আর রাণীগঞ্জ থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে জেলার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় - পাহাড় নয় টিলায়, এক প্রাচীন জৈনমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্তিটিই বিহারীনাথ, আর সেই নামানুসারে ১৪৮০ ফুট উচু টিলাটির নামও বিহারীনাথ। ব্যক্তি আমার কোনও মন্দির বা সেখানে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সম্পর্কে ততটা আগ্রহ থাকে না; আগ্রহ তার প্রাচীনত্বে ও অঞ্চলটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বে, ইতিহাসে। বিহারীনাথের প্রাচীনত্ব নিয়ে সংশয় নেই, কারণ জৈন ধর্মের আদি প্রচারক পার্শ্বনাথের সময়েই বাংলার এই প্রান্তিক অঞ্চলে জৈনধর্মের কিছুটা প্রসার ঘটেছিল। এই অঞ্চল থেকে প্যালিওলিথিক বা প্রস্তরযুগের কিছু প্রত্ননিদর্শনও উদ্ধার করা হয়েছিল। ১৯৪২-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গোরক্ষপুর অধিবেশনে (একাদশ) পঠিত শ্রী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় "বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে তিলুড়ী গ্রাম। গ্রামটি ছোটবড় পাহাড়ে পরিবেষ্টিত ও প্রাকৃতিক শোভাসম্পদে সমৃদ্ধ। গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে বিহারীনাথ নামে এক ১৪৬৯ ফুট উচ্চ পাহাড় আছে। ... পাহাড়ের গায়ে এক পাশে একটি বহু পুরাতন শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরস্থিত শিবের নাম বিহারীনাথ। পাহাড়ের পশ্চিম দিকের পাদদেশ হইতে এক সমতল ক্ষেত্র অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেখানে এক বৃহৎ পুরাতন তেঁতুল গাছের নীচে কয়েকটি বড় বড় প্রস্তরপট্ট অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় দেখা যায়। ... এতৎসংক্রান্ত স্থানীয় জনশ্রুতি সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাও দিতেছি। তিলুড়ী-নিবাসী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম যে, তিনি তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়াছেন যে, উক্ত স্থানে চতুর্দিকে পরিখাবেষ্টিত এক প্রকান্ড গড়, প্রাসাদ ইত্যাদি ছিল।" (রচনাসূত্র - উইকিমিডিয়া)

এখন অবশ্য সে সবের চিহ্নমাত্র নেই, তবে পাহাড়ঘেরা এলাকাটির নান্দনিক সৌন্দর্য পর্যটকদের টানে। পিচ বাঁধানো মসৃণ রাস্তা, পাশে স্বচ্ছ জলে টইটম্বুর লেক। জেলার পিকনিক স্পট হিসাবেও বিহারীনাথে মরসুমী ভিড় লেগেই থাকে। আমাদেরও সঙ্গে রাঁধুনি ও রান্নার সরঞ্জাম ছিল। অতএব ওখানেই রান্না ও খাওয়া। তারপর আবার বাস-যাত্রা। এবার গন্তব্য 'বড়ন্তী'...

ভ্রমণার্থীদের কাছে 'বড়ন্তী' এখন খুব পরিচিত স্থান, আকর্ষণীয়ও বটে, যাঁরা ট্রেকিং করেন তাদের কাছে অবশ্যই। পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভালো। তার কোলঘেঁষা জলাধারটিই 'বড়ন্তী' নামে পরিচিতি পেয়েছে। বড়ন্তী মূলত আদিবাসী প্রধান গ্রাম। সেখানে রয়েছে পর্যটন আবাস, কিছু মাঝারি মানের হোটেলও। কিন্তু দীর্ঘ বাসযাত্রায় শরীর অবসন্ন, ক্লান্তও - বিশ্রাম চাইছিল। তাই আদিবাসী গ্রামের ভেতরে যাওয়া হল না, রাত কাটানো হলনা, ভোরে গৌরাঙ্গি পাহাড়ে সূর্যোদয় দেখা হলনা। হলনা পাখির কলকাকলি শোনা। কিন্তু যা দেখলাম তাই বা কম কি? লেকের জলে অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা, প্রতিবিম্বিত গৌরাঙ্গি পাহাড়চূড়ার ছায়া। সে এক মনোরম সৌন্দর্যসুখের দৃশ্যপট যেন। বড়ন্তী লেক যাকে বলছি সেটি আসলে লেক নয়, জলাধার। সরকারি খাতায় এর নাম

রামচন্দ্রপুর সেচ প্রকল্পের জলাধার। মুরাডি গ্রামের মানুষ জলাধারটির নাম পরিবর্তন চেয়েছিল, হয়নি। তবু কালক্রমে আদিবাসী জনমনে প্রচারিত হতে হতে জলাধারটি পরিচিতি পেয়েছে 'বড়ন্তী' নামে। জলাধারটির গায়ে মাথা উচু করা পাহাড়টির নাম 'গৌরাঙ্গি', বড়ন্তী নয়। আর যে নদীকে বেঁধে এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল তার নাম 'মচকন্দ জোড়'। হোটেলে দেখা করতে এসেছিলেন পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র আমার বন্ধু অসিত চট্টোপাধ্যায়। অসিত এই প্রকল্পের কাজে সেচ বিভাগের কর্মী হিসেবে যুক্ত ছিলেন প্রথম থেকেই। অসিতের কাছ থেকে অনেক অজানা তথ্য পেলাম। জলাধার নির্মাণ ও বড়ন্তি মৌজা থেকে মুরাডি মৌজা পর্যন্ত ৯০০ মিঃ লম্বা বাঁধ দেওয়া শুরু ৭৬-৭৭ সালে। শেষ হয় ১৯৯১-তে। এই সেচ প্রকল্প থেকে সুবিধা পায় পাঁচ হাজার একর কৃষি জমি। বাঁধ ও জলাধারের দক্ষিণ প্রান্ত 'বড়ন্তি' মুলত আদিবাসী এলাকা। এখানেই গড়ে উঠেছে পর্যটক আবাসন। ওই ছোট্ট গ্রামে থাকার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই। সকালবেলায় পাখির কলতান ও সন্ধের পর বুনো জন্তুর ডাকে মুখর হয় পাহাড়ি গ্রাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য ভ্রমণার্থীদের পুরুলিয়া ভ্রমণ গন্তব্যে 'বড়ন্তী'কে রাখতেই হবে তাতে অন্তত আমার কোন সংশয় নেই। অতঃপর বিশ্রাম। বিশ্রাম, মানে শরীরের ব্যথার সামান্য মেরামত করা। রাতের বিশ্রাম মাইথন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে কল্যাণেশ্বরীতে।

শিরশিরে হালকা ঠান্ডার মনোরম সকালে কল্যাণেশ্বরী মন্দির ঘুরে এলাম। আমাদের সব প্রাচীন মন্দির, স্থাপত্য সম্পর্কে নানান লোককথা, প্রবাদ ও লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরটিও তেমন লোকবিশ্বাসের বাইরে নয়। এখানে মহাশক্তির পূজা নাকি বহু প্রাচীন। এখনকার মন্দিরটি পঞ্চকোটের শেখর রাজবংশের একান্নতম রাজা কল্যাণশেখরের পৃষ্ঠপোষকতার নির্মিত হয়। ১২৯০ থেকে ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল কল্যাণশেখরের রাজত্বকাল। লোকবিশ্বাস, সন্তানহীনা নারী জাগ্রত দেবী কল্যাণেশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করলে তার সন্তানেচ্ছা পূরণ হয়। মায়ের স্থান বা মায়ের থান কথা থেকেই নাকি 'মাইথন' শব্দটার উৎপত্তি - যেখানে বহুখ্যাত দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মাইথন জলাধার ও বাঁধ। এবার তবে চলো মাইথন। কল্যাণেশ্বরীর পালা চুকিয়ে, জলযোগ করে, সকালেই বেরিয়ে পড়লাম। পাঁচ কিলোমিটার দূরের গন্তব্য মাইথন জলাধার ও বাঁধ।

কৈশোরে অনেকের মত আমারও ডাকটিকিট জমানোর নেশা ছিল। এখও স্মৃতিতে আছে ১৯৫৭-র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত একটা ডাকটিকিট, যাতে লেখা ছিল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন আর সঙ্গে মাইথন বাঁধ প্রকল্পের ছবি। খুঁজলে আজও হয়তো ডাকটিকিটটা আমার সংগ্রহ থেকে পাওয়া যাবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম নদী-বাঁধ প্রকল্প উন্মুক্ত হয় ১৯৫৭-র সেপ্টেম্বর। তার ষাট বছর পরে সেই বিশাল জলাধার ও বাঁধটিকে চাক্ষুষ দেখা আর ষাট বছর আগে মনের ক্যামেরায় ধরে রাখা সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার একটা উত্তেজনা থাকে বৈকি !

প্রথাগত ভ্রমণলেখায় মোটেই দড় নই। আমি খুঁজে দেখতে চাই ইতিহাস আর ইতিহাসের নির্মাণ যারা করেন সেই মানুষগুলোকে। মাইথন আর পাঞ্চেত বাঁধ প্রকল্প যেন দুই যমজ ভাই। পঁয়ষট্টি বর্গকিলোমিটারের মাইথন জলাধার বরাকর নদীকে বেঁধেছে আর পাঞ্চেত বশ করেছে বর্ষায় ভয়ঙ্কর দামোদরকে। স্বাধীন ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের এই দুটি নদীবাঁধ প্রকল্প, কিন্তু পরিকল্পনার শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার আগে থেকেই । তার পেছনেও একটা গল্প আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪২-এ দামোদর উপত্যকায় প্রবল বন্যায় প্রায় দশ সপ্তাহ কলকাতা দেশের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখনকার ইংরাজ সরকার ১৯৪৫এ দামোদর উপত্যকায় তিনটি নদীবাঁধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা রূপায়িত হয় ১৯৫৫তে 'তিলাইয়া' এবং যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৫৯এ 'মাইথন' ও 'পাঞ্চেত' প্রকল্প।

সেইসময় তাঁর দেহও উদ্ধার করা যায় নি। শোনা যায় যে, কিছুদিন পরে তাঁরই সঙ্গে একই বাঙ্কারে থাকা এক বন্ধু বহুমুখী মাইথন ও পাঞ্চেত প্রকল্প দামোদর উপত্যকার গ্রামীণ জীবনে, অর্থনীতিতে নিশ্চিত সমৃদ্ধির জোয়ার এনেছে। আবার পাঞ্চেত জলাধারের কাছে গিয়ে হয়তো বা এক করুণ কাহিনিও আমার মত কারও কারও মনে পড়ে যাবে, ভারাক্রান্ত হবে মনটা। ১৯৫৯-এ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এসেছিলেন পাঞ্চেত প্রকল্প উদ্বোধন করতে। কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের দুই সাঁওতাল কর্মী বুধনি মেঝান ও রোবন মাঝিকে নেহরুকে অভ্যর্থনা করার জন্য আহ্বান করেন। অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী পনেরো বছরের তরুণী বুধনি নেহরুকে মাল্যদান করে। উদ্বোধনের পর বুধনি নিজ গ্রামে ফিরে গেলে তার সমাজ সিদ্ধান্ত নেয় যে বুধনি নেহরুকে সজ্ঞানে মালা পরিয়েছে সুতরাং নেহরুকে সে বিবাহ করেছে আর যেহেতু নেহরু সাঁওতাল নন, তাই অন্যজাতের পুরুষকে বিবাহ করার দোষে বুধনি সমাজচ্যুত হয়। এমনকি তার পরিবারও বুধনিকে গ্রহণ না করে গ্রাম ছাড়া করে দেয়। চোখের সামনে আঁধার নেমে আসে বুধনির। পরে পাঞ্চেত প্রকল্পের এক কর্মী সুধীর দত্ত আশ্রয় দেন। পরবর্তীতে বুধনির গর্ভজাত কন্যাকেও সাঁওতাল সমাজ গ্রহণ করেনি। ১৯৬২-তে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বুধনিকে কর্মচ্যুত করে। তেইশ বছর ধরে লড়াইয়ের পর সাঁওতাল রমণী বুধনি ১৯৮৫-তে তখনকার প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাজীব তাঁকে কাজে পুনর্বহাল করেন। ষাট বছর ধরে কুলটা অপবাদ নিয়ে আজও বুধনি বেঁচে আছেন। এখনও পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা বুধনির মনে পড়ে সে দিনের কথা। বলেন, "শীতের সকাল, উত্তুরে হাওয়া বইছে হু হু কইরে। কম্পানি দামোদরের উপর বাঁধ দিছে। তারই কী এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রীটন্ত্রী আইসবেক। মন্ত্রী এইলেন বটে। সঙ্গে বাঁধ দিলেন আমার জীবনে। সমাজ থিকে বাইদ গিলাম ওই বাঁধের কারণে।" (বুধনির উদ্ধৃতিটি নিয়েছি 'ইনাডু ইন্ডিয়া' / বাংলা সংস্করণ থেকে)।

পাঞ্চেত জলাধারের গা বেয়েই যেন মাথা উঁচু করেছে পঞ্চকোট বা পাঞ্চেত পাহাড়। জলাধার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে ৬৪৬ মিটার উঁচু 'গড় পঞ্চকোট' পাহাড়। ১৮৭২-এ অর্থাভাবে জর্জরিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত কয়েক মাসের জন্য পঞ্চকোট রাজার আশ্রয়ে তাদের এস্টেট ম্যানেজারের পদে কাজ করেছিলেন। সেই সময় পঞ্চকোট পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ মধুসূদন লিখেছিলেন –

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্বতকুলের পাখা; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে
পঞ্চকোট! রয়েছে যে-লঙ্কায় যেমনি
কুম্ভকর্ণ-রক্ষ, নর, বানরের রণে-শূন্যপ্রাণ,
শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি-
রয়েছ যে পড়ে হেথা অন্য সে কারণে। (পঞ্চকোট গিরি)।

বহু উত্থান-পতনের সাক্ষি হয়ে আজও রয়েছে পঞ্চকোট রাজাদের গড়ের ধ্বংসাবশেষ গড় পঞ্চকোট। কত লোককথা, পঞ্চকোট রাজাদের লোক-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার কত কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। রাঢ় বাংলার ভাদু গানে পূজিত ভাদুমণি নাকি ছিলেন পঞ্চকোট রাজা নীলমণি সিংদেবের তৃতীয়া কন্যা ভদ্রাবতী। বিবাহের পূর্বে ভাবী স্বামীর মৃত্যুতে মানসিক আঘাত পেয়ে ভদ্রাবতী আত্মহত্যা করেন। সেই থেকেই ভাদু গানের উদ্ভব, যে গানে কুমারী নারীর প্রেমের কথা, তার বারোমাস্যা ব্যক্ত করে এমনই লোককথা প্রচলিত। ঝুমুর গানেরও উদ্ভব পঞ্চকোট রাজের পৃষ্ঠপোষকতায়। এ সম্পর্কে কিংবদন্তীটি এই রকম – কোন এক পঞ্চকোট রাজার মহিষী ছিলেন রানী বসুমতী। বসুমতীর নৃত্য-গীত শিক্ষক ছিলেন সুবল নামের এক যুবক। নৃত্যগীত শিক্ষার মধ্য দিয়ে সুবল হয়ে যান রানী বসুমতীর গোপন প্রেমিক। বসুমতী-সুবলের প্রেম ভালোবাসার কথাই প্রকাশিত হয় ঝুমুর গানের মধ্য দিয়ে। কিংবদন্তী ঝুমুরশিল্পী সিন্ধুবালা দেবীও ছিলেন পঞ্চকোট রাজার সভাগায়িকা। এ যাত্রায় জয়চন্ডী পাহাড় থেকে ১২/১৪ কিলোমিটার পথ কাশীপুরের পঞ্চকোট রাজবাড়ি দেখা হয়নি অবশ্য।

জয়চন্ডী পাহাড় হয়ে ছৌ-গ্রামে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ছৌ নাচ দেখেই ইতি টেনেছি আমার 'গন্তব্য পুরুলিয়া'য়। রাজস্থানের জয়সলমীর ঘোরার অভিজ্ঞতায় দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের দৌলতে ওখানকার অটোচালক বা ছোট ট্যুর অপারেটররা সোনার কেল্লা বললেই সেই হাভেলিটাতে নিয়ে যাবে যেখানে 'সোনার কেল্লা'র শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ। ঠিক তেমনই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার গা ঘেঁষা জয়চন্ডী পাহাড়ের কোলের মাঠে পা দিলেই যেন গুপী-বাঘার ভোজনদৃশ্য আর উদয়ন পন্ডিতের পাঠশালার দৃশ্যগুলি চোখে সামনে চলে আসে। মনে পড়বে, আরে এখানেই তো গুপী-বাঘার উদয়ন পন্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১৯৭৮-এ সত্যজিৎ রায় তাঁর বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র 'হীরক রাজার দেশে' ফিল্মবন্দি করেছিলেন এখানেই। পাহাড়ের নিচের গ্রামটির নাম 'নন্দুয়ারা'। জয়চন্ডীর এই পরিচয়টুকু ছাড়াও যারা ট্রেকিং করেন তাদের কাছে পাশাপাশি তিন পাহাড় জয়চন্ডী, কালি পাহাড় এবং যুগ ঢাল পাহাড় আকর্ষণীয়। জয়চন্ডীর চূড়ায় আছে চন্ডীমাতার মন্দির ও হনুমান মন্দির। সেখানে যাওয়ার রাস্তা আছে। এখন কংক্রিটের সিঁড়িও হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটা ওয়াচ টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ।

পাহাড়ের নীচে ছড়ানো ছিটানো বোল্ডার পেরিয়ে প্রশস্ত মাঠ বা জলাশয়ের পাশে নির্জনতাকে সঙ্গী করে দু দন্ড বিশ্রাম নিলে এক অনন্য প্রশান্তি যেন মনটাকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। আমরা সড়কপথে গিয়েছিলাম তাই জয়চন্ডী রেলস্টেশনে পা রাখার সুযোগ হয়নি। শুনেছি আদিবাসী পল্লীর এই নির্জন রেল স্টেশনটি নাকি ভারী মনোরম।

জয়চন্ডী পাহাড় হয়ে ছৌ-গ্রামে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ছৌ নাচ দেখেই ইতি টেনেছি আমার 'গন্তব্য পুরুলিয়া'য়। রাজস্থানের জয়সলমীর ঘোরার অভিজ্ঞতায় দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের দৌলতে ওখানকার অটোচালক বা ছোট ট্যুর অপারেটররা সোনার কেল্লা বললেই সেই হাভেলিটাতে নিয়ে যাবে যেখানে 'সোনার কেল্লা'র শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ। ঠিক তেমনই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার গা ঘেঁষা জয়চন্ডী পাহাড়ের কোলের মাঠে পা দিলেই যেন গুপী-বাঘার ভোজনদৃশ্য আর উদয়ন পন্ডিতের পাঠশালার দৃশ্যগুলি চোখে সামনে চলে আসে। মনে পড়বে, আরে এখানেই তো গুপী-বাঘার উদয়ন পন্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সত্যজিৎ রায় তাঁর বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরক রাজার দেশে' ফিল্মবন্দি করেছিলেন এখানেই। পাহাড়ের নিচের গ্রামটির নাম 'নন্দুয়ারা'। জয়চন্ডীর এই পরিচয়টুকু ছাড়াও যারা ট্রেকিং করেন তাদের কাছে পাশাপাশি তিন পাহাড় জয়চন্ডী, কালি পাহাড় এবং যুগ ঢাল পাহাড় আকর্ষণীয়। জয়চন্ডীর চূড়ায় আছে চন্ডীমাতার মন্দির ও হনুমান মন্দির। সেখানে যাওয়ার রাস্তা আছে। এখন কংক্রিটের সিঁড়িও হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটা ওয়াচ টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ।
পাহাড়ের নীচে ছড়ানো ছিটানো বোল্ডার পেরিয়ে প্রশস্ত মাঠ বা জলাশয়ের পাশে নির্জনতাকে সঙ্গী করে দু দন্ড বিশ্রাম নিলে এক অনন্য প্রশান্তি যেন মনটাকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। আমরা সড়কপথে গিয়েছিলাম তাই জয়চন্ডী রেলস্টেশনে পা রাখার সুযোগ হয়নি। শুনেছি আদিবাসী পল্লীর এই নির্জন রেল স্টেশনটি নাকি ভারী মনোরম।

এবার ফেরার পালা। জয়চন্ডী থেকে অযোধ্যা পাহাড়ঘেঁষা লহৌরি গ্রামে কিছুটা সময় কাটিয়ে চলে এলাম বাঘমুন্ডি ব্লকের ছৌ-গ্রাম চড়িদায়। সেখানে মুখোশশিল্পীদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো আর ছৌ শিল্পী ও চড়িদার গ্রামীণ মানুষজনের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ছৌ নাচ দেখার চেয়ে পুরুলিয়া ভ্রমণের ভালো সমাপ্তি আর কী হতে পারে! আমরা লহৌরি গ্রামে পৌঁছেই যোগাযোগ করে রেখেছিলাম। উপযুক্ত সাম্মানিকের বিনিময়ে ছৌ-গ্রামের একটা মাঠে শেষ বিকেলে আয়োজন হল 'অভিমন্যু বধ' পালার। চড়িদা গ্রামের সারি সারি ঘরে শিল্পীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছৌ মুখোশ বানিয়ে চলেছেন। অবাক বিস্ময়ে তাঁদের সূক্ষ্ম কাজ দেখি। গ্রামের রাস্তার মোড়ে বিশ্ববন্দিত ছৌনাচ শিক্ষক ও শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার মূর্তি ভ্রমণার্থীদের কতটা সম্ভ্রম আদায় করে জানি না। গম্ভীর সিং খ্যাতি পেয়েছিলেন, পদ্মশ্রী সম্মাননাও পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতে

মুখোশশিল্পীদের দারিদ্র ঘোচে না।
কথা বলছিলাম মুখোশশিল্পী এক যুবকের সঙ্গে। জানালেন একটা মুখোশ বানাতে লেগে যায় পাঁচ থেকে ছয় দিন। মাটিতে মুখোশের আকার দিয়ে তাকে শুকোতে চলে যায় তিনদিন, তারপর তাতে রঙের প্রলেপ দিয়ে আবার শুকোনো। শেষে সেই মাটির মুখোশের ওপর জরি চুমকির সুক্ষ্ম কাজ। মুখোশ বানিয়ে তাঁদের পেট ভরে না। কেউ কেউ অন্য মূর্তি বানানো শিখছেন, কেউবা কলকাতার থিমপুজোয় ডাক পান। ভ্রমণার্থীরা আসেন শিল্পীদের কাজের বাহবা দেন, কেউ কেউ কেনেন দু-একটা, কারো কাছে বা তা অর্থের অপচয় মনে হয়। পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশের নাকি বিশ্বজোড়া নাম। কিন্তু বিপণনের যোগ্য বন্দোবস্ত নেই। কলকাতা বা বড় শহরে পুরুলিয়ার মুখোশের বিপণন কেন্দ্র আছে কি না কেউ কি জানেন? এমনকি পুরুলিয়া সদরেও খুঁজে পেতে দুটি কি তিনটির বেশি নেই। বিপণনের সমস্যা নিয়েও এরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছৌ মুখোশ বানিয়ে চলেন। একদল গ্রামীণ মানুষ বাংলার লোকসংস্কৃতির অনন্য রূপ ছৌ নাচকে বাঁচিয়ে রেখেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেও।

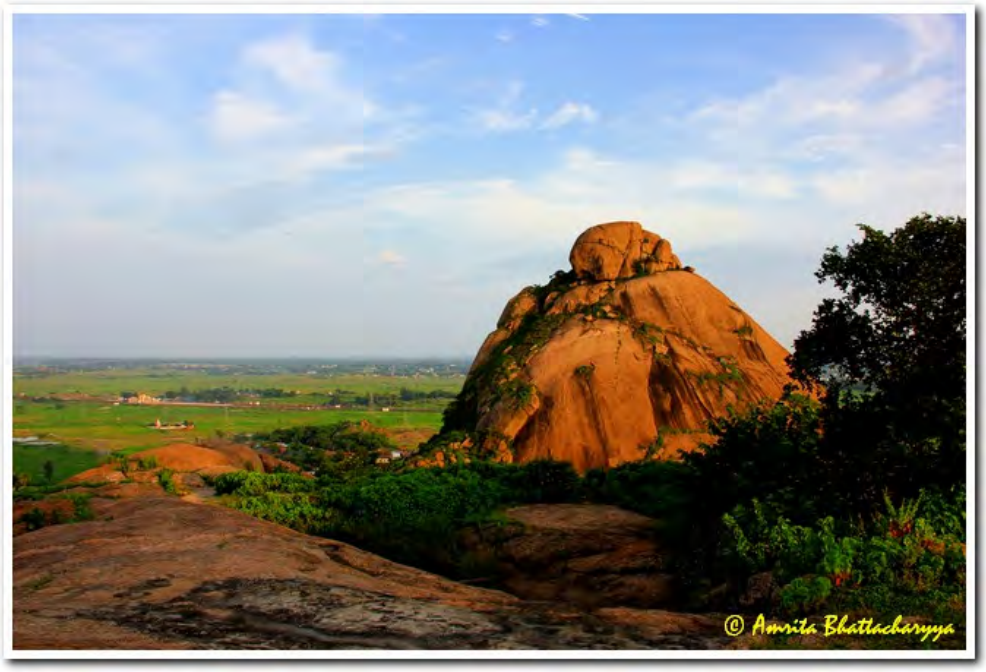

~ *মানভূমের আরও ছবি* ~

প্রবীণ সাহিত্যকর্মী ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় সাহিত্য ও সমাজভাবনার নানান বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প ও নাটক লেখেন। রেলওয়েতে চাকরির সুবাদে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন ছত্তিশগড়ে। এখন উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। 'অন্যনিষাদ' ও 'গল্পগুচ্ছ' নামে দুটি ওয়েব পত্রিকা সম্পাদনা করেন। "আমাদের ছুটি" পত্রিকাতেই তাঁর ভ্রমণ লেখার হাতেখড়ি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

কালাপানির অন্দরমহলে

— পর্ণা সাহানা

~ আন্দামানের তথ্য ~ আন্দামানের আরও ছবি ~

~ প্রথম পর্ব ~

অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সমুদ্রভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পেল। চাকরিসূত্রে দিল্লি আসার পর থেকে শুধুই হিমালয় চলছিল, এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়। কিন্তু এবার আন্দামান যাওয়ার তোড়জোড় বেশ অনেকদিন আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছিলাম। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিই আন্দামান ভ্রমণের সেরা সময়। অফিসে ছুটি নেওয়া থেকে টিকিট কাটা - সব নভেম্বরের মধ্যেই সেরে ফেলা গেল।
বিয়ের পর থেকে সব বেড়াতে যাওয়ার যাবতীয় ঝক্কি আমাকেই পোহাতে হয়। প্ল্যানিং থেকে হোটেল বা গাড়ি বুকিং সব দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে পতিদেবতাটি ঝাড়া-হাত-পা হয়ে গলায় সাধের ক্যামেরাটি ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এবার আমার শর্ত ছিল অভিষেককে সব দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু বেরোনোর আগের দিন দেখলাম দু-চারটে হোটেলের নাম টুকে রাখা ছাড়া আর কোনও ব্যবস্থাই সে করতে পারেনি। হোটেল বুকিং করার ব্যাপারে একটা বাধা অবশ্য ছিল - ফেরি শিডিউল-এর অনিশ্চয়তা। অতএব শুধুমাত্র ফ্লাইট টিকিট এবং আমারই বানানো একটি দৈনিক ভ্রমণখসড়া হাতে নিয়ে রওনা হলাম সাগর পাড়ি দিতে।

৩০.১.২০১৭ :

কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট কাকডাকা ভোরে। অর্থাৎ জানলার পাশের সিটে বসে সূর্য আর প্লেনের আকাশে ওঠা একসঙ্গেই দেখা যায়। এরোপ্লেন থেকে সূর্যোদয় দেখা এক মজার অভিজ্ঞতা। দিগন্ত রেখার ওপরে বসে নিচে সুয্যিমামার ঘুম ভাঙতে দেখা যায়। সাদা মেঘের সমুদ্রে তখন ছড়িয়ে পড়ছে আরও একটা নতুন দিনের নতুন আশার ঢেউ। মন গুনগুন করে ওঠে – "আজ ম্যায় উপর, আসমাঁ নিচে!"
বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি অথচ চোখের সামনে কেবলই মেঘের রাজ্য। অবশেষে এক সময় ডাঙার দেখা পাওয়া গেল। বিপুল জলরাশির মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সবুজে ঢাকা দ্বীপরাজি। এই সেই আন্দামান, ইতিহাসে যার উপস্থিতি অধিকাংশই কলঙ্কে মোড়া। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নির্বাসনের দ্বীপ, 'কালাপানি' নামের কালিমা ঘুচতে যার সময় লেগে গেছে অনেক বছর।
আমাদের ফ্লাইট নামল সেই কালাপানির বুকে। ছোট্ট একটা এয়ারপোর্ট। ততোধিক ছোট রানওয়ে। লাগেজবেল্টের সামনে প্রতীক্ষা। চিরকাল দেখেছি কোনও এক অলৌকিক মন্ত্রবলে আমাদের ব্যাগগুলোই আসে সবার শেষে ! সব যাত্রী যখন হোটেলে পৌঁছে গেল হয়ত, তখন হেলতেদুলতে তারা এল। বেরিয়ে এসেই পাওয়া গেল গাড়ি। আমাদের কোনও হোটেলে বুকিং নেই, অগত্যা সারথিই ভরসা এখন। ছেলেটির নাম পুগাল, আদতে তামিল, কিন্তু আন্দামানেই জন্ম, বেড়ে ওঠা। 'আমি থাকতে আপনাদের কোনও চিন্তা নেই' – এই আশ্বাসবাণী অবলম্বন করে তার বাহনে চড়ে বসলাম। ছেলেটি যেন সরলতার প্রতিমূর্তি। অবশ্য আগামী কয়েকদিন আন্দামানে থাকতে থাকতে বুঝেছি, এটা বোধহয় এই জায়গাটারই গুণ। ক্রাইম-ট্রাইম এখানে হয়না বললেই চলে এবং হোটেল বা অন্যান্য সর্বত্র স্থানীয় লোকজন আমাদের যতটা বিশ্বাস করেছে, আমরা হয়ত নিজেদেরও ততটা করতে পারি না।
পোর্ট ব্লেয়ার আমার দেখা প্রথম জায়গা যেখানে এয়ারপোর্ট থেকে মূল শহরের দূরত্ব খুবই কম। এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র পনেরো মিনিটের দূরত্বে একটি হোটেলে এনে গাড়ি দাঁড় করালো পুগাল। হোটেল "কোস্টাল ব্রিজ।" কোলাহল থেকে দূরে, শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে ভীষণ ঘরোয়া এই হোটেলটি দেখেই মনে ধরে গেল। ব্যবস্থাপনারও কোনও ত্রুটি নেই। চেক-ইন করেই পুগালের সঙ্গে ঠিক করে নেওয়া হল আমাদের ভ্রমণের প্রাথমিক খসড়া। সে নিজেই দায়িত্ব তুলে নিল ফেরি টিকিট এবং প্রয়োজনীয় পারমিট-এর। অতএব নিশ্চিন্ত।

বেড়াতে এসে হোটেল বন্দী হয়ে থাকা আমার ঘোর অপছন্দের। স্নান সেরেই বেরিয়ে পড়লাম চারপাশটা ঘুরে দেখতে। হোটেলটা একটু চড়াই অঞ্চলে। বেরিয়ে সামান্য নিচের দিকে হাঁটা দিতেই সমুদ্রের নীল ধরা দিল চোখে। রাস্তাঘাট ঝকঝকে তকতকে। ধুলো নেই-ই, তাই উড়ছেও না। আকাশও তাই যেন একটু বেশিই নীল এখানে। তখনও বুঝিনি আরও কত অজস্র রকমের নীল আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে এই গোটা ভ্রমণসূচীতে। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছলাম। কাছেই আবেরডিন জেটি। কিছুক্ষণ জাহাজের আনাগোনা দেখে আর নীলচে-সবুজ জলের মুগ্ধতা নিয়ে এবার ফেরার পালা। মাথার ওপর সূর্যদেব ক্রমশই প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে চলেছেন। তাছাড়া দুপুরে খাওয়াদাওয়া করেই

ঘুরতে বেরোনোর প্ল্যান।
যথাসময়ে গাড়ি নিয়ে পুগাল এসে গেল। আন্দামান এসে মাছ খাব না, তাও কি হয়? হোটেলের কাছেই 'আনন্দ' রেস্তোঁরায় ফিশ সিজলার সহযোগে লাঞ্চ সেরে নেওয়া গেল। (সদ্য ফেসবুকে 'আমাদের ছুটি'-র গ্রুপে সরিৎ চ্যাটার্জীবাবুর লেখা 'কালাপানি' ধারাবাহিকে এই রেস্তোঁরার উল্লেখ দেখে পুরোনো কথা মনে পড়ে মনটা বেশ ভালো হয়ে গিয়েছিল।) খাওয়ার পর্বের শেষে রওনা দিলাম সেলুলার জেলের উদ্দেশ্যে।

এই সেই সেলুলার জেল! কালাপানির কালান্তক ইতিহাসের প্রতিমূর্তি, রক্ত আর নৃশংসতার,

অত্যাচার আর যন্ত্রণার সাক্ষী। সিপাহী বিদ্রোহের পর স্বাধীনতাসংগ্রামীদের জন্যে ব্রিটিশদের তৈরি 'পেনাল সেটলমেন্ট' - যেন এক মূর্তিমান নিষ্ঠুরতা। সেন্ট্রাল টাওয়ার থেকে ছড়িয়ে পড়া সাতটি বাহু (বর্তমানে তিনটিই আছে), প্রতিটি তিনতলা, সর্বমোট ৬৯৩ টি কারাকক্ষ। বাহুগুলির নির্মাণ আবার এমনই যে একটির সম্মুখভাগ অপরটির পশ্চাতভাগের মুখোমুখি, যাতে বন্দীরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারে। বন্দীদের জন্যে বরাদ্দ এক একটি ছোট ছোট খুপরি, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার স্বাধীনতাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ঘড়ির কাঁটার শৃঙ্খলে। লম্বা টানা বারান্দা, লোহার দরজা, ফাঁসির দড়ি - সব কিছুই আজও ব্যক্ত করে চলেছে সেই কষ্টের ইতিহাস, চোখের জল এখানে বাঁধ মানে না। প্রতিটা ইট-কড়িকাঠে সোচ্চার হয়ে ওঠে সওয়াশো বছরের জমানো হাহাকার।

বুকের মধ্যে জমে ওঠা ভারি বোঝাটা হালকা হয়ে ওঠে জেলের ছাদ থেকে সমুদ্র দেখে। গাঢ় নীল জল, কোনও কোনও দিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে ঘন সবুজে ঢাকা। এই অপরূপ রূপশোভা কতদিন ঢেকে ছিল অত্যাচারের অন্তরালে। কষ্টগুলোতে লাগাম দিয়ে বেরিয়ে এলাম এই রাষ্ট্রীয় স্মারক থেকে। বোঝাটা আরও হালকা হল করবিন'স কোভ বিচে গিয়ে। ছোট্ট বিচ, ধার দিয়ে সারি সারি নারকেল গাছ। ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবল গতিতে ছুটে চলা জেট-স্কি দেখেই রক্তে অ্যাডভেঞ্চারের নেশাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অভিষেক যদিও প্রথমে গাঁইগুঁই করছিল, কিন্তু কান টানলে মাথার না এসে উপায় কী?

ওখান থেকেই আবার ফেরা সেলুলার জেলে, লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখতে। আলোর ব্যবহার তেমন আকর্ষক না হলেও জেলের প্রাচীন ইট-পাথর আর প্রাচীনতর অশ্বত্থ গাছের কথোপকথনের মাধ্যমে সব অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চোখে জল এনে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট।
আজকের মত ঘোরাঘুরি এখানেই শেষ। এবার পালা হোটেলে ফেরার।

৩১.১.২০১৭ :

আন্দামানে এলে বাঙালিদের পরবাস বলে মনে হওয়া সম্ভব নয়। যেমন বাঙালি পর্যটকদের ভিড়, তেমনি প্রচুর বাঙালির বসবাস। আমাদের হোটেলের রিসেপশন স্টাফও বাঙালি, শ্যামলদা। এছাড়া এক বাঙালি প্রবীণ দম্পতিও এসে উঠেছেন এই হোটেলে। সকালে বেরোনোর আগে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব, বাইরে এসে মঙ্গলবারে নিরামিষ খাওয়ার বিড়ম্বনা, আগামীকাল সরস্বতী পুজো নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সবই চলল। পুগাল যথাসময়ে এসে গেছে। আজ আমাদের গন্তব্য রস আর নর্থ বে আইল্যান্ড। বোটের (এখানে যদিও ফেরি বলে) টিকিটের ব্যবস্থা পুগাল করে রেখেছে কথামত। বোটের নাম 'মুসাফির।' আজ এই বোটে উঠে সেই যে লাইফ জ্যাকেট পরার অশান্তি শুরু হল, সেটা চলল বাকি পুরো ট্রিপে, শেষ দিন পর্যন্ত। এটা পরে না যায় ঘাড় ঘোরানো, না যায় সাবলীল ভাবে বসা। লাইফ জ্যাকেট তো নয়, যেন গলায় মরণফাঁস!

রস আইল্যান্ড আবেরডিন জেটি থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। পৌঁছে দেখলাম গোটা দ্বীপ জুড়েই নারকেল গাছের আধিক্য। এটি একটি ছোট দ্বীপ। প্রথমে এখানেই কারাগার তৈরির পরিকল্পনা হয়, পরে এটিই হয়ে ওঠে 'প্রাচ্যের প্যারিস।' এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। ব্রিটিশ, জাপানি, সবাই দখল করতে চেয়েছে। এখানেই প্রথম উত্তোলিত হয়েছিল স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা, নেতাজির হাত ধরে ১৯৪৩ সালে। এখন সেই যুগের খানিক ভগ্নাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সত্যি কি নেই কিছু? এর হাওয়া, নিরলস ভেঙে চলা সমুদ্রের ঢেউ তো কত গল্প শোনায়, যারা শুনতে

পায়, তারা পায়। সেই গল্পের আশায় হাঁটা লাগলাম। সময় বরাদ্দ আছে দেড় ঘন্টা, তার মধ্যে যতটা ঘুরে নেওয়া যায়। হাঁটছি, দেখছি, মাঝে মাঝে মুগ্ধতা বন্দী হয়ে উঠছে মুঠোফোনে। কয়েকটা হরিণ আশ্চর্যজনক নির্ভীক ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করে চলেছে সব পর্যটকদের গা ঘেঁষে। দরকারমত মডেল হয়ে পোজও দিচ্ছে বেশ।

রস থেকে পাড়ি দিলাম নর্থ বে। স্কুবা ডাইভিং সকালেই বুক করে নেওয়া হয়েছে এখানের জন্যে, পোর্ট ব্লেয়ার থেকেই। 'জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা' সিনেমাটির অনেকগুলো অনুপ্রেরণার মধ্যে এটা অন্যতম। 'মুঝে আফশোস করনা নেহি আতা' আর 'করনা ভি নেহি চাহিয়ে' - ওই সিনেমার-ই এই দুই সংলাপ মনে এত দাগ কেটেছিল যে এখনও জীবনের সব ক্ষেত্রে এই জীবনদর্শন বজায় রাখার চেষ্টা করি। তাই, ছোট থেকেই জলে চূড়ান্ত ভীতি থাকা সত্ত্বেও আন্দামানে এসে স্কুবা না করার আফশোস যাতে বয়ে না বেড়াতে হয়, এটা আমি করবই। ওখানে পৌঁছে ধড়াচূড়া পরে জলে নামতেই দেখলাম ভয়-টয় সব কোন ফুসমন্তর বলে উধাও। এখানে স্কুবা ইন্সট্রাকটরও বাঙালি ছেলে। চশমা পরে জলের নিচে তাকাতেই মনটা এক অদ্ভুত উত্তেজনায় ভরে গেল। ব্রিদিং পাইপ দিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া অভ্যেস করে জলের নিচে নেমে পড়া হল। সে এক অনাবিল প্রশান্তির জায়গা। কোনও শব্দই কর্ণগোচর হয়না, এবং এই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন আমি একা এক অন্য অচেনা জগতে। যত্র তত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির প্রবাল। একের পর এক রং-বেরঙের মাছের ঝাঁক ছুটে আসছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে, অনুভব করতে পারছি তাদের আলতো দংশন। আমি যেন এই অলীক রূপকথার জগতে জলপরী। এ যেন নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জায়গা, নিজের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জায়গা। সারা জীবনের জন্যে অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ হল এক বিপুল ঐশ্বর্যের সম্ভারে।

জল থেকে উঠে লাঞ্চ সেরে হাঁটা দিলাম লাইট হাউসের দিকে। এ আমাদের সবার চেনা, ভারতীয় ২০ টাকার নোটে যে লাইট হাউসটি দেখা যায়, এটা সেটাই। বোটে আসার সময়েই দেখেছি একরাশ নারকেল গাছের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে লাল-সাদা বাতিঘর। কিছুটা চড়াই ভেঙে বাতিঘরের সামনে পৌঁছনো তো গেল, কিন্তু ওপরে ওঠার অনুমতি মিলল না। অগত্যা উল্টো পথে ফিরে চলা।
ফেরার পথে আবার আর এক প্রস্থ জলের ঝাপটা খেতে খেতে এলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর যাওয়া হল ফিনিক্স বে জেটি, সেখান থেকে আবার যাব রস আইল্যান্ড, লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখতে। সব আন্দামান ভ্রমণার্থীদের জন্যে আমার অনুরোধ, এটি দেখার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। বেশির ভাগ ট্যুর অর্গানাইজারদের ভ্রমণসূচীতে এটি থাকে না। কিন্তু এটি আমার দেখা সেরা আলোক-ধ্বনি প্রদর্শনী। দ্বীপের ইতিহাস অত্যন্ত সুচারুতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সঙ্গে বাড়তি পাওনা গুলজার সাহেবের লেখনী আর শাবানা আজমির অনন্য বাচনভঙ্গি। দুধনাথ তেওয়ারির বিশ্বাসঘাতকতা, গ্রেট আন্দামানিজদের বিদ্রোহ, দ্বীপের প্রাচুর্যের দিন, সেখান থেকে গরিমা অবলুপ্তি - সব সুদক্ষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই উপস্থাপনাটিতে। কখন যে নিজেই হারিয়ে যাই সেই দেড়শ বছর পেছনে, কখন যে সংগ্রামের আগুন আমার বুকের ভেতরেও জ্বলে ওঠে, কখন যে সব বীর শহিদের আত্মত্যাগের মহানতা চোখ ঝাপসা করে দেয়! আর এই সব কিছুর সাক্ষী থেকে যায় আকাশের একফালি চাঁদ, তার সঙ্গিনী দুই উজ্জ্বল তারাকে নিয়ে।

১.২.২০১৭ :

বেড়াতে এলেই দেখেছি খুব ভোর ভোর ঘুম ভেঙে যায়। আর এখানে সারাদিন বেশ গরম থাকলেও শেষ রাতে বেশ হালকা শীতের অনুভূতি হচ্ছে। আজ প্ল্যানমাফিক আমরা যাব মহাত্মা গান্ধী মেরিন ন্যাশনাল পার্ক। বেশ অনেকগুলি দ্বীপের ফ্লোরা আর ফনা-র সংরক্ষণের জন্যে এই পার্কটি তৈরি। তবে পর্যটকদের গতিবিধি মূলত: দুটি দ্বীপে সীমিত - জলি বয় (নভেম্বর - এপ্রিল) আর রেড স্কিন (মে - অক্টোবর)। আয়তনে রেড স্কিন অনেকটাই বড় জলি বয়-এর থেকে। জলি বয় অন্যান্য দ্বীপগুলোর থেকে অনেকটা দূরে, যেখানে জলের গভীরতা অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই বর্ষাপ্রবণ সময়ে সেখানে পর্যটকদের যাওয়ার অনুমতি থাকে না। ওয়াণ্ডুর বিচ-এর কাছে একটি জেটি থেকে বোট ছাড়ে। যেতে সময় লাগে প্রায় এক ঘন্টা।
বোটে উঠেই আবার সেই লাইফ জ্যাকেট পরার জ্বালাতন। তবে যাওয়ার পথটা খুব সুন্দর। দুদিকে ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে মোড়া দ্বীপেদের সঙ্গী করে সুনীল জলে সাদা ফেনা তুলে এগিয়ে চলেছে আমাদের বোট। অবন ঠাকুরের 'কাটুম কুটুমের' সঙ্গে পরিচয় আমার সেই ছোট্টবেলায়, বাবার হাত ধরে। শুধু এটাই নয়, ছোট থেকে আমার যা কিছু বই পড়া, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে, সবটাই বাবার জন্য। তো সেই 'কাটুম কুটুম' মনের একটা বিরাট আগ্রহের জায়গা জুড়ে ছিল ছোট থেকেই। এখনও দেখলাম সেই উৎসাহে কোনও খামতি নেই। যখনই বোট কোনও দ্বীপের ধারে আসছে, পাড়ের গাছ-গাছালির গুঁড়ি দেখে মন কল্পনা করে নিচ্ছে বিভিন্ন পরিচিত আকৃতি। এদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল, সেটা হল - হাঁটু ভাঁজ করে জলে ডুবিয়ে রাখা কোনো যুবতীর দুধসাদা পদযুগল! কি নিখুঁত সেই আকৃতি। এই ছেলেমানুষিগুলো আমার বড় প্রিয়, মেঘ দেখেও এমন রূপকথা রচনা করি। এই কল্পনার রূপকথাই আমার জগৎ, এই পাগলামিমাখা ভালোলাগাগুলি বেঁচে থাকার অক্সিজেন, একাকীত্বের সঙ্গী।

জলি বয় আইল্যান্ডটি যেন নীলবসনা সুন্দরীর কপালে একটুকরো সবুজ টিপ। এখানে কোনও স্থায়ী জেটি নেই। বোট এসে দাঁড়ায় একটি রবার জেটির সামনে, সেখান থেকে নৌকো করে দ্বীপে পৌঁছতে হয়। যাওয়ার পথে একটি গ্লাস বটম বোট রাইড করানো হয়, কোনো অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়াই। সেটা নিতান্তই একটা ট্রেইলার মাত্র। এরপর আলাদা করে ৪০-৪৫ মিনিটের আরেকটা রাইড করা যায়, মোট তিনটি কোরাল রিফ

ঘুরিয়ে দেখানো হয়। কত বিভিন্ন প্রজাতির প্রবাল যে দেখলাম! কলিফ্লাওয়ার, মাশরুম, বোল্ডার - যেমন বিচিত্র তাদের নাম, তেমনই বিপুল তাদের বৈচিত্র। এর সঙ্গে নানারকম মাছ তো আছেই। নানা রঙের জেলি ফিশ, মুক্ত-ঝিনুক, সমুদ্রশসা, সী এনিমুন-এ লুকিয়ে থাকা ক্লাউন ফিশ- সব মিলিয়ে এ এক স্বপ্নের দেশ।
এখানেও সমুদ্রের রং দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। নীল ও সবুজের যে কী অপূর্ব মিশ্রণ! চোখের সামনে যেন কোনও সম্মোহনের মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে এক অদৃশ্য জাদুকর। ফেরার পথে তখন ভাঁটা চলছে। আসার পথে দেখা সেই যুবতীর পায়ের পাতা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এখন।

ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে গেলাম ওয়ান্ডুর বিচে। সুয্যিমামা তখন দিনের পাট মিটিয়ে ছুটি নিতে উদ্যোগী। যাওয়ার বেলায় ঝুলিতে বেঁচে থাকা সব আবির যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশের গায়ে। লাল, কমলা, গোলাপি - সব। নাকি বেলাশেষের বিদায়ী চুম্বনে প্রেমিকা আকাশ রেঙে উঠছে লজ্জায়? বিচটি বেশ নিরিবিলি। তাই নিজের মত করে প্রতিটা মুহূর্ত বাঁচার সুযোগও অনেক বেশি। এখানে ওখানে পড়ে আছে মৃত প্রবাল। সমুদ্রতটে ছড়ানো রং বেরঙের ঝিনুক, শামুক, আরও কত কী! সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালেই মনটা কী ভীষণ উদাস হয়ে যায়! সামনে এক অসীম, বিশাল শূন্যতা আর তার মাঝে আমি যেন একা। এই পৃথিবীতে এটাই যেন চিরন্তন সত্য - একাকীত্ব। নিরলসে ভেঙে চলা ঢেউ দেখতে দেখতে হেঁটে যেতে পারি আমি শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। অভিষেক তখন ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত, মুহূর্তগুলোকে বন্দী করতে। আমি শুধু সেগুলোতে বেঁচে নিই, প্রাণ ভরে। পান করি অমৃতসুধা। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে পারি আমি। এ যেন নিজের সবচেয়ে ভালবাসার মানুষটার মুখোমুখি বসে থাকা, চুপচাপ, শুধু চাহনিই কথা বলে যায়। ক্লান্ত হলে তার কাঁধে মাথা রেখে সব দু:খ ভুলে যাওয়া। আর লেখা হয়ে যায় কত অপ্রকাশিত প্রেমের কবিতা।

২.২.২০১৭ :

আন্দামানের নামকরণের ইতিহাস নিয়ে বেশ কয়েকটি ভিন্ন মত শোনা যায়। পবনপুত্র হনুমানের 'হন্ডুমান' বা 'অন্ডুমান' নাম থেকেই নাকি আন্দামান নামকরণ। কারও কারও মতে আন্দামান নামের অর্থ ভগবানের দেশ, আবার কেউ বলেন এ নাকি সোনার দেশ। তো নামের মানে যাই হোক, ক্রমেই আন্দামানের প্রেমে পড়ে চলেছি আমি। কী যেন একটা ম্যাজিক আছে এই জায়গাটায়। সবকিছুই যেন কেমন একটু বেশি ভালো লাগে। এমনকি সারাদিনের প্রখর রোদেও কষ্ট বোধ হয় না। বরং একটুখানি শীতল হাওয়ার স্পর্শেই যেন মন খুশিতে ভরে ওঠে। আজ আমাদের হ্যাভলক যাওয়া। আন্দামানের সবথেকে আলোচ্য ও সর্বাধিক জনপ্রিয় জায়গা। এখানকার রাধানগর বিচ বিশ্বের সেরা দশটি সমুদ্রসৈকতের অন্যতম। পোর্টব্লেয়ার থেকে সরকারি ফেরি ছাড়াও কয়েকটি প্রাইভেট সংস্থার বিলাসবহুল ফেরিও চলে। 'Makruzz' এদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের টিকিট এতেই। এখানেই অমৃতা, আমার ইস্কুলতুতো বোনের সঙ্গে দেখা। কী মিষ্টি ওর কন্যাটি। যদিও জ্বরে ভুগে বেচারি ভালো করে ঘুরতে পারছে না। অভিষেকের একটু সি-সিকনেস হল দেখলাম এই জাহাজে। আগেই গুগল-এ রিভিউ দেখেছিলাম যে অনেকেরই এই সমস্যা হয় আর তাই নিয়ে নিজেই খুব চিন্তিত ছিলাম। তবে আমার কোনও অসুবিধা হল না। দেড় ঘন্টার জায়গায় পৌঁছতে প্রায় দু'ঘন্টা সময় লেগে গেল। হ্যাভলক জেটিতে পুগালের বন্ধু কান্নানের গাড়ি নাম-লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষা করছে। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, এখানকার দায়িত্বও পুগাল নিয়েছে। তার বন্ধুর গাড়ি ও হোটেল ঠিক করে রেখেছে। হোটেল কেমন হবে তা নিয়ে একটু ভাবনা ছিল, কিন্তু পৌঁছে খুব পছন্দ হয়ে গেল। এটি হ্যাভলক-এর বিজয়নগর বিচ (বিচ নং. ৫)-এ । এখানেও হোটেল কর্মচারীরা সবাই বাঙালি। খাওয়া-দাওয়াও খুব ভালো, একদম ঘরোয়া রান্না। পুরো হোটেল পরিসরটাই খুব সুন্দর। অসংখ্য নারকেল আর সুপারি গাছ। আর সবথেকে ভালো ব্যাপারটা হল হোটেলের ঠিক পেছনেই বিচ। প্রাইভেট বিচই বলা যেতে পারে এটাকে। যেকোনও সময় এই বিচে অবারিত দ্বার।

আমরা সকালে স্নান-টান সেরেই এসেছি। তাই এসেই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে শুরু করলাম বিচে এসে নারকেল গাছের ছায়ায় বসে। একটি বিদেশি দম্পতি এখানে একমাস থাকার প্ল্যান করে এসেছে! অবশ্য সুযোগ থাকলে আমারও তা করতে কোনও অসুবিধে নেই। জাহাজে আসতে আসতেই কিছুটা বুঝেছি, এখানে পৌঁছে আরও ভালো করে উপলব্ধি করলাম কেন হ্যাভলক নিয়ে ভ্রমণার্থীদের মধ্যে এত উন্মাদনা থাকে। কোনও এক সুদক্ষ চিত্রকর এখানকার সমুদ্রের ক্যানভাসে ইচ্ছেমত খেলা করেছে তার প্যালেট-এর নীল আর সবুজ রং নিয়ে। এই রং-এর কী নাম দেওয়া যায় আমি জানি না (যদিও নানা জায়গায় দেখেছি এটাকে Emareld Blue বলা হয়েছে, কিন্তু একে যেন কোনও নামে বেঁধে রাখা যায়না, এমনই তার বৈচিত্র্য)। খেলতে খেলতে কখন এক সময় রং ফুরিয়ে গেছে, তাই আর সমুদ্রতটে রং দিতে পারেননি শিল্পী। বালির রং তাই চোখে পড়ার মতো সাদা। আর এই যুগ্ম বৈপরীত্য রচনা করেছে এক অতুলনীয় ছবি। হ্যাঁ, পুরো জায়গাটা ছবির মতই সুন্দর। চোখের সামনে যেন কোনো এক বিশাল ক্যালেন্ডারের পাতা টাঙিয়ে দিয়েছে কেউ, অথবা এক সুবিশাল স্ক্রিনে ডিসকভারি বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের ট্রাভেল শো চলছে! নাহলে বাস্তব কি এমন সুন্দর হতে পারে? এমন সৌন্দর্য ছেড়ে কেন কেউ বিদেশ ভ্রমণের কথা ভাবে?

সৈকতের নারকেল গাছগুলোর সঙ্গে সমুদ্রের জলের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। রোদে-ছায়ায়, আলো-আঁধারিতে তাদের গোপন প্রেমালাপ চলছে যুগ যুগ ধরে। সমুদ্র শীতল হাওয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রেম নারকেল গাছকে নিবেদন করে, আর গাছ তার পাতার শনশন আওয়াজে সম্মতি জানায়।

কখনও বা নিজেকে সমুদ্রের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে ঝুঁকে পড়ে তার বুকে। ঢেউ এসে তাকে ছোঁয়, দিয়ে যায় চুম্বন। এই প্রেমকাহিনি দেখার জন্যে তো সারাদিন বসে থাকা যায়। কিন্তু এই কল্পনার জগত ছেড়ে বাস্তবে ফিরতে হয় খিদের টানে। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে একটু বিকেল হলে আমরা গেলাম 'কালাপাথর বিচ।' দিনের আলাদা আলাদা সময় সমুদ্র আলাদা আলাদা সাজে নিজেকে সাজায়। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় তখন তার পরনের বসনে অন্য রং। এখানে সমুদ্রতটের একদিকে প্রচুর মৃত প্রবাল। বিশাল বিশাল পাথরের মত ছড়িয়ে আছে। হয়ত সেই কারণেই বিচের নামকরণ। অন্য দিকে এদের আধিক্য তেমন নেই। বরং সাদা বালির বুকে মাঝে মাঝেই পড়ে আছে ভাঙা গাছের গুঁড়ি। এদের দেখেও নানারকম 'কাটুম কুটুম' কল্পনা করা যায়। কোনোটা যেন বীর শহিদ, প্রাণ ত্যাগ করেও হাতের মশালটা উঁচু করে ধরে রেখেছে। কোনটা আবার অলস ভঙ্গিতে এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে শুয়ে থাকা কোনও মানুষ। ভাবনার পরিধি তো কোনো গন্ডিতে বাঁধা যায়না, মনকে যত উদার করা যায়, ভাবনা ততটাই বিস্তৃত। তাই যেমন ইচ্ছে ভাবি, আমার ভাবনার জগতটা তো শুধুই আমার। বাধা দেওয়ার জন্যে এখানে পর্যটকদের ভিড়ও নেই বললেই চলে। ভাবতে ভাবতেই হাঁটছি, সাদা ভেজা বালির বুকে সবুজ শ্যাওলা মাখা ছোট ছোট প্রবালগুলো রচনা করেছে এক নৈসর্গিক রূপ।

সারা আকাশ জুড়ে অস্তরাগের নেশা ছড়িয়ে দিয়ে সূর্য আজকের মত বিদায় নিল। আকাশের মেঘগুলো পাঠশালার কচি কচি ছেলেগুলোর মত। হেডস্যার চলে যেতেই নিজেরা রং পেন্সিল নিয়ে দুষ্টুমি শুরু করে। আকাশে ছেলেমানুষি আঁকিবুঁকি কাটে। একসময় তারাও বিদায় নেয়। আকাশও ঘুমিয়ে পড়ে। আগামী দিনের আশা বুকে বাঁচিয়ে রেখে। আমরাও ফিরে আসি, চোখে অনেক মায়া, অনেক আলো মাখিয়ে।

৩.২.২০১৭ :

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, বাইরে তখনও অন্ধকার। সামান্য আলো ফুটতেই বেরোলাম, পেছনের বিচটা থেকে সানরাইজ দেখা যায়। পৌঁছে দেখলাম তিন-চারজন বিদেশি ছেলে মেয়ে ধ্যান করছে সমুদ্রতীরে বসে। ভোরের প্রথম আলোয়, মৃদুমন্দ বাতাসে, ঢেউদের আনাগোনায় মন সত্যিই শান্তিতে ভরে ওঠে এখানে। রাত্রির আঁধারের আঁচল ছিঁড়ে সূর্যের প্রথম আলোকরশ্মি যখন দেখা দেয়, আকাশ রাঙিয়ে ওঠা লজ্জায় তখন বরণ করে নেয় আর একটি নতুন সকাল।

প্রাত:রাশ সেরে তড়িঘড়ি চলে এলাম জেটিতে। এলিফ্যান্ট বিচ যাওয়ার টিকিটের জন্যে ফর্ম জমা করে অপেক্ষা করছি বোটের। আমাদের নাম যখন ডাকা হল, টিকিট সংগ্রহ করে বোটের কাছে এসে দেখলাম আমাদের সহযাত্রী বেঙ্গালুরুর এক পরিবার, স্বামী-স্ত্রী আর দুই ছোট বাচ্চা। কনিষ্ঠটি তো সাংঘাতিক মিষ্টি! জেটি থেকে এলিফ্যান্ট বিচে পৌঁছতে প্রায় আধঘন্টা মত সময় লাগে। এখানে একটি অসাধারণ কোরাল রিফ আছে, তাও আবার খুব কম গভীরতায়। স্নর্কেলিং এর জন্যে আদর্শ এই বিচ। এখানেও বোট কর্তৃপক্ষ থেকে একটি কম সময়ের স্নর্কেলিং করানো হয়, টিকিটের দামের মধ্যেই এটা অন্তর্গত। তবে এতে স্বাদ মিটবে না। আলাদা করে আর একটি করা যায়, যেটাতে কোরাল রিফের বেশি আকর্ষণীয় অংশগুলো ঘুরিয়ে দেখানো হয়। একবার স্কুবা করে আমার সাহস এখন তুঙ্গে, আর রক্তে অ্যাডভেঞ্চারের নেশাও টগবগ করে ফুটছে। সুতরাং আবার নেমে পড়লাম জলে। স্নর্কেলিং-এ অবশ্য স্কুবার মত জলের নিচে ডুব দিতে হয়না। টিউবের সাহায্যে জলের ওপর ভেসে থেকে শুধু জলের নিচে দেখতে হয়। এখানেও বৈচিত্রের বিপুল সম্ভার। কতরকমের মাছ আর প্রবালই যে দেখলাম! অভিজ্ঞতার তূণীরে আরো একটি পালকের সংযোজন হল আজ।

এখানে সি-ওয়াকও হয়, কিন্তু সেদিন আর জায়গা ফাঁকা ছিল না। আমাদের তেমন ইচ্ছেও ছিল না আরও একবার জলে নামতে। ফিরতি বোটে ফিরে এলাম হ্যাভলক জেটিতে। সেখান থেকে রিসর্টে। ভেজা জামা কাপড় যদিও পাল্টে নিয়েছিলাম ওখানেই, কিন্তু সারা গায়ে তখনও বালি ভর্তি। ভালো করে স্নান সেরে নিলাম এসেই। আজ বিকেলে যাব সেই বহুচর্চিত রাধানগর বিচে। বেশ উত্তেজনায় ভরে আছে মন।

রাধানগর বিচে পৌঁছে কিন্তু উত্তেজনা বেশ খানিকটা দমে গেল। এত ভালো ভালো কথা শুনেছিলাম, এত ভালো ভালো রিভিউ পড়েছিলাম, এমনকি আমার বান্ধবী নিবেদিতাও তার আন্দামানের সামান্য কয়েকটি ভালো লাগার জিনিসের মধ্যে এটিকে রেখেছে, তাই হয়ত জায়গাটার থেকে প্রত্যাশা বেড়ে গেছিল অনেকটা। ততটা কিন্তু পেলাম না। হতে পারে সেটা অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে, বা অন্য কিছু - ঠিক বুঝিনি। কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব অনুভূত হল। এই ক'দিনে বাকি জায়গাগুলো যতটা আপন মনে হয়েছিল, এখানে যেন সেই আত্মিক টানটা নেই। হয়ত আমারই অক্ষমতা, কিন্তু এই জায়গাটাকে আমি নিজের করে নিতে পারলাম না। তা বলে অবশ্য এর সৌন্দর্যকে ছোট করার কোনও অবকাশ নেই। অর্ধচন্দ্রাকৃতি সৈকতটিতে সেই সাদা আর নীলের বৈপরীত্য। ভিড় এড়াতে আমি যথারীতি হাঁটা দিলাম প্রান্তের দিকে। সমুদ্রসৈকতে দূর থেকে দেখে মনে হয় ওই অর্ধচন্দ্রের ঠিক কোনাটাতে পৌঁছলেই সমুদ্রের মধ্যে চলে যাব। কিন্তু সেই কোণটা আর কখনই খুঁজে পাওয়া যায়না! যাওয়া, আসা সব সারা হয়ে গেল, সূর্য এখনও বেশ উঁচুতে, কড়া চোখে অতিউচ্ছ্বাসী জনগণকে নজরে রাখছে। আমি বসলাম একটা ছাউনির তলায়, অভিষেক গেল ডাব কিনতে। ঠিক এমন সময় চোখে পড়ল - একটা শিমুল গাছ। আগত বসন্তের বার্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, তার লাল বসনে। এই প্রথম রাধানগরকে ভালো লাগল, একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প যেন সেই ক্ষণিক মুহূর্তে লেখা হয়ে গেল গোপনে।

ডাব খেতে খেতেই দেখি সুয্যি পাটে নামছেন। আবার সেই মায়ার খেলা, সেই মায়াবী আলো, সেই রঙের নেশায় মাতোয়ারা চারপাশ। আরো একবার আচ্ছন্ন হয়ে ফিরে এলাম। কালকেই চলে যাব এখান থেকে। তাই ইচ্ছে করছে আরও একটু ছুঁয়ে থাকতে, আরও একটু গন্ধ মাখতে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

~ *আন্দামানের তথ্য* ~ *আন্দামানের আরও ছবি* ~

পছন্দের বই আর গান পেলে বাকী পৃথিবীকে আলাদা করে দিতে সময় লাগে না পর্ণা সাহানার। প্রিয় অবসর বিনোদন নানারকম রান্না আর হস্তশিল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রালয়ে কর্মরতা। নিজের হাতে সংসার গোছানোয় বিশেষ যত্নশীল। মাঝে মাঝেই মুক্তির আনন্দে বেরিয়ে পড়া কারণ ছোটবেলা থেকেই পায়ের তলায় সর্ষে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select - ▼

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like One person likes this. Be the first of your friends.

tell a Friend

ঘাটশিলার জঙ্গল-পাহাড়ে

তপন পাল

~ *ঘাটশিলার তথ্য* ~ *ঘাটশিলার আরও ছবি* ~

-১-

ঘাটশিলা আমি হামেশাই যাই। কিন্তু সে তো শুধু শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা। বাউড়িয়া থেকে সকাল দশটা বত্রিশে ৬৮০০৩ মেমু (Mainline Electric Multiple Unit - শহরতলি ও গ্রামীণ এলাকার জন্য ভারতীয় রেলের গণপরিবহন ব্যবস্থা) ধরে, জানালার পাশে বসে, দুপুর একটা পঞ্চাশে ঘাটশিলা পৌঁছানো; তারপর মিনিট পনের দাঁড়িয়ে, এপাশের জানালা থেকে ওপাশের জানালায় গিয়ে, ওই গাড়িতেই ফিরে আসা। ঘাটশিলা দুপুর দুটো পাঁচ, বাউড়িয়া পাঁচটা উনিশ, গাড়ির ক্রমিক ৬৮০০৪। তবে এই যাত্রাটা আমি খুব উপভোগ করি। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, ভাড়া কম, কানা দামোদর, দামোদর, রূপনারায়ণ পেরিয়ে খড়গপুর। খড়গপুরের পর গাড়ি সব স্টেশনে থামে, স্থানীয় লোকজন ওঠে নামে, ভিড়ের চরিত্র ক্রমে বদলে যায়। কেলেঘাই কংসাবতী পেরিয়ে ঝাড়গ্রাম। তারপর থেকে ভূচিত্র বদলায়। মাটির রং বদলে লাল। জানালায় সমতল, বাড়ি-ঘরের ওয়ালপেপারের পরিবর্তে আসে পাহাড় ও জঙ্গল, কাজলা গাং, ডুলুং নদী পেরিয়ে গিধনি, কানি মোহুলি; নিচু প্ল্যাটফর্ম বিলীন হয়ে গেছে দিগন্তে - জঙ্গল টাঁড় পেরিয়ে। চাকুলিয়া কোকপাড়া ধলভূমগড় পেরিয়েই ঘাটশিলা। তবে ওই আর কি, কে বলে 'যাও যাও'– আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া। ঘাটশিলা শহরটিকে ও তার পারিপার্শ্বিককে পাপচক্ষে দেখা হয়ে ওঠেনি মোটে। আর এজন্য বাড়িতেও মধ্যে মধ্যে গঞ্জনা শুনতে হয়, কারন পুত্র ভূতাত্ত্বিক এবং ছাত্রাবস্থা থেকেই ঘাটশিলার সঙ্গে তার প্রগাঢ় সখ্য।

তাই যখন জানা গেল যে ২০১৭-র ১০ই মার্চ থেকে ১২০২১ /১২০২২ হাওড়া-বরাবিল-হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ছমাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ঘাটশিলায় থামবে, যাওয়ার পথে সকাল নটা তেরোয় এবং ফেরার পথে বিকেল পাঁচটা একচল্লিশে, তখন আমার যে কী আনন্দ হল বলার নয়। যাক বাবা, উপরওয়ালা মুখ তুলে চেয়েছেন, এবারে আমার ঘাটশিলা দর্শন হবে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি যখন এই ট্রেনটি চালু হয় তখন আমি থাকতাম হাওড়ার দানেশ শেখ লেনের এক সরকারি আবাসনে। রেলগাড়িটিকে দেখতে এক সকালে পুত্রকে নিয়ে মৌরিগ্রাম গিয়েছিলাম, তখন ইনি ছিলেন শতাব্দী; ছ কামরার।

তদনুযায়ী রবিবার দোসরা এপ্রিল সক্কালবেলা হাওড়া। ১২০২১ হাওড়া বরাবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস নতুন ঘাঁটিতে লম্বায়মান। আঠারো কামরার গাড়ি, ইঞ্জিন, এস এল আর, ডি ১ থেকে ডি ১১, ডি আর ১, তারপর সি ১ থেকে ৪, আবার এস এল আর। এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি যে কোন রেলগাড়ির রেকে উচ্চশ্রেণীর কামরাগুলির অবস্থান কোথায় হবে তা নিয়ে রেল কোম্পানির নির্দিষ্ট নীতি আছে। দেখতে হবে রেলগাড়িটির রেক কোন জোনের। সেই প্রান্তে উচ্চশ্রেণীর কামরাগুলি থাকবে। ১২৮৬০ গীতাঞ্জলী এক্সপ্রেস দক্ষিণ-পূর্ব রেলের গাড়ি, কিন্তু তার রেকটি পূর্বতট রেলপথের, তাই হাওড়া থেকে ছাড়ার সময় উচ্চশ্রেণির কামরাগুলি সামনের দিকে থাকে। প্রতিতুলনায়, ১২৩৪৫ সরাইঘাট বা ১২৩১৩ শিয়ালদহ রাজধানী পূর্বরেলের গাড়ি, রেকদুটিও পূর্ব রেলপথের, তাই যথাক্রমে হাওড়া বা শিয়ালদহ ছাড়ার সময় উচ্চশ্রেণীর কামরাগুলি পিছনের দিকে থাকে। আর এস এল আর মানে Seating Cum Luggage Rake যাতে গার্ড সাহেব থাকেন, লাগেজ ভ্যান থাকে বুক হওয়া মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য, আর কিছুটা জায়গা থাকে অসংরক্ষিত মহিলা এবং/ অথবা প্রতিবন্ধীদের বসার জন্য। এই কামরাগুলিতে পাঁচ জোড়া দরজা থাকে, তাই সহজেই গোচরযোগ্য। ভারতীয় রেলে সাধারণত প্রতি রেলগাড়িতে দুটি করে এস এল আর কামরা থাকে; একটি ইঞ্জিনের পরেই, অপরটি সবার শেষে।

জীবনস্মৃতিতে বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিমালয় বাসের কথা স্মরন করেই লিখেছেনঃ 'আমার যৌবনারম্ভে এক সময় আমার খেয়াল গিয়াছিল আমি গরুর গাড়িতে করিয়া গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইবো। আমার এই প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিলো। কিন্তু আমার পিতাকে যখনই বলছিলাম তিনি বলিলেনঃ "এ তো খুব ভাল কথা, রেলগাড়িতে ভ্রমণ কে কি ভ্রমণ বলে।"' কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই প্রসঙ্গে বলি, ঠিক এইরকমটাই আজকাল মনে হয় বিমানভ্রমণ প্রসঙ্গে। দেশে অভ্যন্তরীণ বিমানভাড়া এখন খুবই কম, ক্ষেত্র বিশেষে বাতানুকুলিত দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়েও কম। এর সঙ্গে সময় সংক্ষেপের ব্যাপারটাতো আছেই। তাই অফিসের কাজে অথবা বেড়াতে দূরে কোথাও গেলে আজকাল বিমানেই যাওয়া হয়। রেলগাড়িতে গেলে দেখি কিভাবে সময় ও অতিক্রান্ত দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে সহযাত্রীদের পোশাক-আশাক, মুখের ভাষা, খাবার দাবার, এমনকি চায়ের ভাঁড়ের আকার ও আকৃতিও বদলে যাচ্ছে। নতুন নতুন স্টেশনে গাড়ি থামছে, উঠছে সেখানকার বিখ্যাত খাবাররা, বর্ধমানের সীতাভোগ, মালদার আমসত্ত্ব, মেচেদার শিঙ্গাড়া। ছুটন্ত রেলগাড়ির জানালায় বসে গলা বাড়িয়ে না-থামা রেলস্টেশনের নাম পড়তে পড়তে অদ্ভুতদর্শন নাম পেলে হেসে ওঠার অভিজ্ঞতা আমাদের সবায়েরই অল্পবিস্তর আছে। কালা বকরা বা ইব, সিঙ্গাপুর রোড বা চিঞ্চপক্লি, টুং বা ঘুম... রেলস্টেশনের এমন নাম দেখলে কার না হাসি পায়? Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, নামে বিলেতে (ANGLESEY) একটি রেলস্টেশন আছে বলে শুনেছি; তবে এ জীবনে তা দেখা হয়ে ওঠে নি। বিমানভ্রমণে সেসব কিছুই নেই, হুশ করে উঠল আর নামিয়ে দিল।

রেল মানে শুধুই দুটো লোহার পাতের ওপর দিয়ে ছুটে চলা এক গাড়ি নয়; উপমহাদেশে রেল সামাজিক প্রগতির অগ্রদূত। রেলব্যবস্থা যদি

সামাজিক উন্নয়নের catalyst হয়, তবে ঐতিহাসিক পারম্পর্যটি বোঝার জন্য রেল ও বৃহত্তর সমাজের interface টি বোঝা অতীব জরুরি; বোঝা দরকার কিভাবে তারা একে অপরকে প্রভাবিত করেছিল ও একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো। বাঙালিকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে রেল বলা চলে। সহজ থেকে সহজতর হয়েছে যোগাযোগ রেলগাড়িতে। শান্তিলতা দেবীর তাই রেলপূর্ব সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে গচিহাটায় যেতে লাগতো আড়াই দিন আর রেলগাড়ি হওয়ায় তা লাগল পাঁচ থেকে ছ'ঘন্টা। হিন্দু মুসলমান বৈষম্য ভেদাভেদ দূর করে রেল বাঙালিকে এনেছিল এক সুতোর মালায়। জাতিভেদ দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়েছিল রেলগাড়ির কামরা - তাইতো আঠারবাড়ি রেলষ্টেশনে ট্রেনের কামরায় শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী যখন কমলালেবু খেতে শুরু করেন সহযাত্রী মুসলমানের সামনে তখন হিন্দু যুবকের বারণ আর "কমলালেবুর জল আছে সেজন্য জলচরার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত;" তা মানেননি।

আমাদের (গৌরবার্থে বহুবচন, নচেৎ এ অভাগা সঙ্গী পাবে কোথায়?) সংরক্ষিত বাতানুকূল শ্রেণির টিকিট। উঠে বসা গেল জানালার ধারে। যথাসময়ে (ছটা পঁচিশে) রেলগাড়ি ছাড়ল। পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে, পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া। যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া। তা আনন্দগান বড়ই জমজমাট, গাড়িটিতে ভক্ষ্য আহার্যের বড়ই পারিপাট্য। ঝালমুড়ি, মোচার চপ, সিঙ্গাড়া, টক দই, মিষ্টি দই, আমদই, ভুট্টাপোড়া, রসগোল্লা, স্যান্ডউইচ, ডিম টোস্ট, মাখন টোস্ট, নরম পানীয়, ফলের রস..., জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। কিন্তু মানবজীবন ধন্য আর হল কই? ছোটবেলা থেকেই খেতে ভালবাসি, খাইও। কিন্তু সম্প্রতি দাঁত নিয়ে বিড়ম্বিত। দাঁত তো আর হৃৎপিণ্ড অথবা ফুসফুসের মত একটি দুটি নয়, গুনে গুনে বত্রিশটি। বিস্তর আর্থিক ও শারীরিক কষ্টস্বীকার করে একটি মেরামত করলে পাশের জন জানান দেয়, আমি আছি। তাকে মেরামত করলে তার পাশের জন; এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর দেখা যায় ডাক্তারবাবুরাও বিগতস্পৃহ হয়ে যান, ও কিছু না, বয়স হলে তো হবেই একটু। ছাত্রজীবন বা শুরুর কর্মজীবনের অনেক পরিচিত বন্ধু এখনও আমাকে মনে রেখেছেন খাওয়ার পরিমাণের জন্য। তারা এখন আমাকে দেখে আশ্চর্য হন। সেদিন কলেজের পুনর্মিলনে যখন একটি আইসক্রিম দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারলাম, তাঁদের অনেকেই আক্ষেপ করছিলেন। তা সে যাকগে! চল্লিশ পেরলে সবারই তো একটি করে পোষা রোগ থাকে, আমার নাহয় পঞ্চান্ন পেরিয়ে দাঁত!! তবে কালোমেঘের অন্ধকারেও তো রুপালি রেখা থাকে। দাঁত নিয়ে বিড়ম্বিত হয়ে আমার ওজন অনেক কমে গেছে; আর তাইতে আমার ডাক্তারবাবু, আত্মীয়পরিজনরা খুব খুশি হয়েছেন।

ক্রিয়া যোগ, পুরী সাঁতরাগাছি, সম্বলপুর হাওড়া, শ্রী জগন্নাথ, সমরসত্ত, শিরোমণি, স্টিল, ইত্যাদি নানাবিধ রেলগাড়ি পেরিয়ে, চেনা পথ বেয়ে অবশেষে ঘাটশিলা। ঘড়িতে তখন সকাল নটা তের। খড়গপুরের পর থেকেই রেলগাড়িতে নিরাপত্তার আধিক্য চোখে পড়ছিল, ঘাটশিলায় রেলগাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তড়াক করে নেমে প্রতিটি দরজার মুখে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন; আমি ভাবলাম আমাকে গার্ড অব অনার দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে বুঝি। সমুদ্রতলের ১০৩ মিটার উঁচুতে এই ষ্টেশন, তিনটে প্ল্যাটফর্ম, আর দুটোর কাজ চলছে। অপরদিকের প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু লোক টাটানগর খড়গপুর মেমুর জন্য অপেক্ষারত আমাদের প্ল্যাটফর্মে ইস্পাতের জন্য।

-২-

ঘাটশিলায় পর্যটন পরিকাঠামোর অবস্থা ভয়াবহ। ষ্টেশনে গাড়িভাড়া পাওয়া গেলনা; বাতানুকূল গাড়ি তো দূরস্থান। অগত্যা এক অতিকায় অটো। আমার অভ্যাস আছে কোথাও বেড়াতে গেলে হোটেল থেকে কার্ড চেয়ে চেয়ে আনা, এবারে ছ'টা হোটেলে চেষ্টা করে মাত্র একটায় কার্ড পাওয়া গেল, তাও সেটা দু বছরের পুরনো; ঘরভাড়া ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে অনেকখানি। বাকিরা তো কার্ড চাই শুনে আকাশ থেকে পড়ল; কেন? কার্ড কী হবে? ঘর লাগলে বলুন! হোটেলগুলিতে হোটেলসুলভ ঝাঁ-চকচকে ভাবটাই নেই; গেরস্ত বাড়ির আটপৌরে ধূলিমলিনতা মাখা তার সর্বাঙ্গে। দুপুরের খাওয়া যা জুটলো সেটি আমি বলে খেতে পারলাম, আপনারা হলে পারতেন না। তবু, তবুও... ঘাটশিলা আমার খুব ভাল লেগেছে। কেন জানেন? সেখানে আর কেউ নেই বলে। যেখানে যাচ্ছি, আমিই সেখানে একতম পর্যটক। বাঙালি পর্যটকের দল কোথাও নেই, কেউ গুটখা খেয়ে থুথু ফেলছেনা; কেউ উচ্চৈঃস্বরে গান শুনছেনা, চেঁচিয়ে কথা বলছেনা, কেউ অটোওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করছেনা। আহা! কী যে শান্তি!

প্রথম বিরতি সুবর্ণরেখা রিভারপয়েন্ট। পাথর জেগে উঠেছে, এই এপ্রিলে জল কম। তার মধ্যেই প্রচুর নারীপুরুষ স্নানরত। শহরে জলাভাব, লোকজন গাড়ি, দ্বিচক্রযান নিয়ে চলে এসেছেন রবিবারে স্নান সারতে। সেখানে দাঁড়ানো গেল না, ফেরার পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মস্ত মস্ত ইঁদারা, রাজবাড়ি, রণকিনী কালীমন্দির। পুজো চলছে, বলির ব্যবস্থা আছে; এবং বলির পাঁঠাগুলি কালীঘাটের সহভাগ্যশালীদের মত কালো নয়, পাটকিলে বা বাদামি। সেখানেও দাঁড়ানো গেল না; দাঁত নিয়ে বিড়ম্বিত হয়ে ইস্তক বলি-তে আগ্রহ হারিয়েছি। অগত্যা রামকৃষ্ণ মিশন। দেখা গেল তীর্থস্থান না হলেও বাঙ্গালির সব ব্র্যান্ড সেখানে সগৌরবে উপস্থিত; রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বাবা লোকনাথ... ।

অপুর পথ বেয়ে গৌরীকুঞ্জ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ - ১ নভেম্বর ১৯৫০) ভদ্রাসন। ১৯১৯ সালে হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়ায় দ্বারকানাথ হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় বসিরহাটের মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাখ্যায়ের কন্যা গৌরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের এক বছর পরই গৌরী দেবী কলেরায় মারা যান। অনেক পরে ১৩৪৭ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ (ইংরেজি ৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০) তারিখে ফরিদপুর জেলার ছয়গাঁও নিবাসী ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে রমা দেবীকে বিয়ে করেন বয়সের বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও। তাঁদের পুত্র তারাদাসবাবু শ্যামনগরে আমাদের স্কুলে সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী ও তার অব্যবহিত পরবর্তী যুগের বাংলার এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা। যে সেলেব্রিটিদের ততটা সামাজিক পরিশীলন ছিল না, ছিল না মেমসাহেব অথবা নিদেনপক্ষে বিদুষী রূপবতী স্ত্রী অথবা বান্ধবী, তারা কেউই কলকাতার অভিজাত সমাজে কঙ্কে পান নি; চলে যেতে হয়েছে দূরে। শরৎবাবু দেউলটি গিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন; বিদ্যাসাগর মশাই অথবা বিভূতিবাবুকে শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজতে হয়েছে আদিবাসীসঙ্গে।

সেখান থেকে রাতমোহনা। সুবর্ণরেখার তীরে এক উন্মুক্ত প্রান্তর যেখানে জ্যোৎস্না নাকি জোনাকির মত চিকমিকায়। এখানেও জল কম। পাথর জেগে উঠেছে। এবং যথারীতি নারীপুরুষ স্নানরত। চারদিকে বৈচিত্রময় পাথর ছড়ানো। ওই পাথরেই নাকি জ্যোৎস্না পড়ে ঝিকমিক করে!

কৌতূহল হল, একটি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে কলকাতায় এসে এক ভূতাত্ত্বিককে দেখালাম। তিনি বললেন micaschist, এতে অভ্র আছে, তাই জ্যোৎস্না পড়ে ঝিকমিক করে। সন্দেহভঞ্জন হল, কিন্তু দুঃখ রয়েই গেল। এখন ঘাটশিলার যা পরিস্থিতি তাতে নাকি কেউই রাতে শহরের বাইরে ওই চরে যেতে সাহস করছেন না। তবে মনশ্চক্ষে দেখে নিলাম ওই বিস্তৃত প্রান্তরে, নীচে জল আর ওপরে আকাশকে রেখে, ছড়ানো পাথরে জ্যোৎস্না কতখানি মায়া বুনে দিতে পারে। সেখান থেকে শহর পেরিয়ে অগণন টিলা আর জঙ্গল পার হয়ে বাসাডেরা গ্রাম। সারা রাস্তা আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো। অটো আর যাবে না, এখান থেকে আদিবাসী গাইড নিয়ে চড়াই পথে জঙ্গল চিরে আধঘণ্টা হাঁটলে ধারাগিরি জলপ্রপাত। বর্ষীয়ান আদিবাসী গাইডটি সকাল থেকেই মহুয়ামাতাল, সস্নেহে ডেকে বললেন, 'রোদে পুড়ে এসেছিস, আগে ইঁদারার হজমি জল খা! তোর বয়স কত রে?' বললাম ষাট, আটান্ন যদি না বোঝে! শুনে সে বলল, তার বয়স আশি। বিশ্বাস হল না। তবে সে সাবধান করে দিল, কাল রাতেও হাতি বেরিয়েছিল। হাতির মুখোমুখি পড়লে কী করতে হবে তাও সে বিমানবালিকাদের সিকিউরিটি ড্রিলের মত পাখি পড়া করে বুঝিয়ে দিল, ঝাঁপ দিয়ে পাশে সরে যেতে হবে, কোনক্রমেই হাতির যাত্রাপথে থাকা চলবে না। শুনে অপার নিস্পৃহতায় আমি হাসলাম; বিমানবালিকাদের অঙ্গভঙ্গি আমি কোনদিন দেখি না, বকবকানি শুনি না। আমি ঠিকই করে নিয়েছি যে কিছু হলে সিটেই বসে থাকব, যা হওয়ার হোক। যেদিন থেকে আমার পুত্র চাকরিতে ঢুকেছে সেদিন থেকে আমি সার সত্য বুঝে গেছি, যে আমার মৃত্যু কারোকে বিড়ম্বিত বিব্রত করবে না। তারপর পৌত্রীটি আসতে ফের বেঁচে থাকার ইচ্ছে হয় বটে, তবে কে না জানে যে আমরা এমনই এসে ভেসে যাই -. আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুমগন্ধরাশির মতন, হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন ভেসে যাই।

তবে হাঁটাপথটি ভারি উপভোগ করলাম। বনস্পতিময় অরণ্য চিরে, দিনের বেলাতেও অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে শুনতে চড়াই পথে যাওয়া। ঝোপের ভিতর দিয়ে নীচু হয়ে উড়ে যায় বউ কথা কও (Black hooded Oriole, Orilus xanthornus), শ্যামা (White-rumped shama , Copsychus malabaricus)। বিগত রাত্রির নাদা নাদা হাতির টাটকা পুরীষ পেরিয়ে, এক পাথুরে অবয়বের সামনে। গ্রীষ্মে জল নেই, তবে বোঝা গেল বর্ষায় জায়গাটির রূপ খোলে, জল আছড়ে পড়ে প্রায় পঁচিশ তিরিশ ফুট ওপর থেকে। পায়ের কাছে একটি কুণ্ডের মত, তাইতে কিঞ্চিৎ জল; শোনা গেল সেটি বছরভরই থাকে। গাছের ছায়ায় ঘেরা জায়গা, রোদ খুব একটা আসে না, স্যাঁতসেঁতে ভাব, প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে শয়ে শয়ে, কমন মরমন (Papilio polytes) প্রজাতির, পুরুষ আছে, আর ওই প্রজাতির স্ত্রীর তিনটি বর্ণ বিন্যাসই (polymorphic), Cyrus, Romulus ও Stichius। অরণ্য, পাথর, জল, স্যাঁতসেঁতে ভাব, এইসব দেখে এক প্রজাতির জন্যে মন কেমন করতে লাগলো; এইই তো তাদের স্বাভাবিক আবাস, সেই যারা বুকে হেঁটে চলে। কোবরা গোত্রের সাপ এখানে না থাকাটাই আশ্চর্যের!

কুণ্ডের পাশে অবধারিত মন্দির, সিন্দুরলেপা চৌকো পাথর, ধর্মরাজের পোড়ামাটির ঘোড়া দুটি। গেরুয়া পরা এক সাধু। তিনি ঘুরঘুর করছিলেন তার মন্দির নির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে। কৌতূহলবশে তাঁর আস্তানায় উঁকি দিতেই দেখা গেল ঠিক যা ভেবেছি তাই; ডগাবাঁকা একটি লাঠি। চেপে ধরতে স্বীকার করলেন গোখরো (Spectacled cobra , Naja naja) সেখানে আছে, এমনকি মধ্যে মধ্যে শঙ্খচূড়েরও (King cobra , Ophiophagus hannah) দেখা মেলে। সেখান থেকে ফিরে, বুরুন্ডি লেক। চার দিকে পাহাড়, মাঝে জলাধার, হু হু করে হাওয়া, জলের কাছাকাছি বলে গরমও বেশ কম। চারপাশে কেউ কোথাও নেই। কিছুক্ষণ বসে রইলাম, তারপর শহরে।

মধ্যাহ্নভোজন। জাতীয় সড়ক চওড়া হচ্ছে, পথিপার্শ্বস্থ হোটেল সব ভাঙা পড়েছে। সরে এসে তারা কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছে। রাস্তার কাজ শেষ হলে আবার সাজিয়ে গুছিয়ে বসবে। তারপর জাতীয় সড়কের গায়েই ফুলডুংরি টিলা, ঝরাপাতা মাড়িয়ে ঘুরে ঘুরে টঙে ওঠা। শুকনো পাতায় খড়খড় শব্দ তুলে রাস্তা পেরচ্ছিলেন এক সর্পদেবতা। প্রথমে ভেবেছিলাম দাঁড়াশ। কিন্তু ইনি দাঁড়াশের মত সোজা পথের পথিক নন, ইনি চলেন এঁকেবেঁকে (Lateral Undulation locomotion)। খুঁটিয়ে দেখে নিশ্চিত হলাম, ইনি খেতমেটে (Banded Racer; Argyrogena fasciolata)। এই প্রজাতিটি আমার চেয়েও দুর্ভাগা। নির্বিষ হওয়া সত্ত্বেও ইনি কিঞ্চিত আগ্রাসী এবং ফণা আছে; তাই অনেকেই এনাকে গোখরোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন ও পিটিয়ে মারেন। ইনি শুকনো জায়গায় থাকতে ও ইঁদুর খেতে বড়ই ভালোবাসেন।

সেখান থেকে গালুডি বাঁধ সুবর্ণরেখার ওপর। জল অল্প, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাথর। বিকেলের রোদ্দুর পড়ে জল চিকচিক করছে, দেখা যাচ্ছে জলের নীচের পাথরের স্তর; কুচো মাছের দল খেলা করছে, লোক মাছ ধরছে। জলে পানকৌড়ি , ডার্টার, লিটল গ্রেব, জলের পাশের পাথরে পন্ড হেরন, ইগ্রেট আর খঞ্জনের মেলা। দূরে গিরিরাজিনীলা। ফেরার পথে মহুলিয়ায় শ্রীমদ বিনয় দাস বাবাজির 'প্রাচীন' রণকিনী মন্দির। রণকিনীর মূল মন্দিরটি যদুগোড়ায়।

ঘুরেফিরে সেই স্টেশনেই। তখন ঘড়িতে পাঁচটা। ফেরা সেই বরাবিল হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেসেই। বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম জনহীন, শুধু এক নম্বরে কিছু লোক খড়গপুর টাটানগর মেমুর জন্য অপেক্ষারত। তুমুল আওয়াজ তুলে গীতাঞ্জলী চলে গেল, তারপর গেল মেমু। সে চলে যেতেই স্টেশনটি ঘুমিয়ে পড়ল। সূর্য ঢলল, বেলা গড়াল, গাছেরা আন্দোলিত; উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের পর কিঞ্চিৎ শীতল অপরাহ্ণ। আমি প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে লম্বা হলাম। দূর থেকে ভেসে এল মাঘরেবের আজানের ডাক। অলস বিকাল, জগত সংসারে কারো কোনও তাড়া নেই; জীবন গড়ায় ঢিমেতালে; শুধু অবিশ্রান্ত হুসহাস করে চলে যায় সতত চলমান মালগাড়িরা।

কিঞ্চিৎ বিলম্বের রেলগাড়ির সংরক্ষিত বাতানুকুলে উঠেই ঘুম। বয়স হলে শুনি অনেকেরই ঘুম কমে যায়, আমার কিন্তু বাড়ছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল, 'সব কিছুর জন্য মম্ দায়ী।' পিছন থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে ভেসে এল - এক মেয়ের কণ্ঠস্বর। চমকে উঠে ফিরে তাকালাম। রেলগাড়ির এই উজ্জ্বল আলোয় মোমবাতি জ্বালাল কে!! ট্রেনে কেক কাটতে গিয়ে বোধহয় মোমের আগুনে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে!! ভাল করে খেয়াল করতে গিয়ে বুঝলাম, ব্যাকডেটেড হয়ে গিয়েছি, বয়স হয়ে গেছে আমার। মোমবাতি নয়, 'মম্', মা জননী। মা। আচ্ছা, এই মম্ আর মায়ের কোলের উষ্ণতার কোনো পার্থক্য আছে কি? বন্ধন মায়া ভালবাসায়? পার্থক্য তো থাকার কথা নয়। তবু কেন আমি ভাবছি আছে?

জ্ঞান হয়ে দেখেছি কিশোরী মাকে; আমার বাউন্ডুলে বাপ তখন দেশের বাইরে। আমরা মামার বাড়ি; জনা তিরিশেক লোক, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, টিয়াপাখি, ধান সেদ্ধ করার আর ময়লা জামাকাপড় ভাটি করার মস্ত লোহার কড়াই ও ভূমধ্যপ্রোথিত উনান; এইসব নিয়ে দিদিমার ভরা সংসার। আমি ও আমার মা দুজনেই সেখানে কাচ্চাবাচ্চার দলভুক্ত; মাকে গুরুজন বলে না ভেবে খেলার সাথি ভেবেই বড় হয়েছি। বস্তুত মাকে তুই বলাটা যে শোভন নয় সেটা বুঝে অভ্যাস বদলেছি অনেক দেরিতে, পনের ষোল বছর বয়সে। তবু তো কখনও মার ওপর চোটপাট করার সাহস হয়নি, এই অতিক্রান্ত আটান্নেও নয়। সেটা কি শাসনের ফল, নাকি আমাদের স্বভাবটাই অমনতর! ভাবা দরকার!

সাঁতরাগাছি নটা কুড়ি।

পরিশিষ্ট -

শান্তিলতা রায় ১৩০০ সনের ২৩শে মাঘ শ্রীহট্ট শহরের একটি শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ নাগাদ। তিনি দুটি বিশ্বযুদ্ধই দেখেছেন । জন্মের পর তিনি তাঁর বাবার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসেন। তাঁর পিতা সেখানে একজন উকিল ছিলেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জের গচিহাটায় । ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাংলাদেশের একটি জেলা। আর গচিহাটা হল কিশোরগঞ্জের একটি গ্রাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও গচিহাটার মধ্যবর্তী দূরত্ব আমি সঠিক জানি না।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী বর্ণনাটি তাঁর "আমার দেবোত্তর সম্পত্তি " গ্রন্থে পাবেন।

কৃতজ্ঞতা -

তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন বাংলাদেশি রেল বন্ধু জনাব মাকসুদুল আলম (ময়মনসিংহ) ও জনাব মাহবুব কবির মিলন (ঢাকা); এবং ONGCর ভূতাত্ত্বিক শ্রীমান তড়িত্বান পাল (কারাইক্কাল)।

~ *ঘাটশিলার তথ্য* ~ *ঘাটশিলার আরও ছবি* ~

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

পলকাটা হিরে - ওরছা

অভিজিৎ চ্যাটার্জী

~ ওরছার তথ্য ~ ওরছার আরও ছবি ~

ঢেউখেলানো মাঠ এখন পাহাড়ি, বিন্ধ্য পর্বতের রাজ্য। মধ্যপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মজা হল মানুষের ভিড় নেই, শহরে লোক বেশি, কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে নেই বললেই চলে! ফলে নিশ্চিন্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মন দেওয়া যায়।

৪৪নং জাতীয় সড়ক থেকে ডানদিকে যেতে শহরের গোলমাল উবে গেল, যেন অন্য জগতে ঢুকলাম। কিছুক্ষণ আগাছাভরা খোলা মাঠের পর, পাথরের ফটক দেখা দিতে লাগল, ওরছার রোমান্স-এর আভাস পেলাম। গেটগুলো ভারী নয়, ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু গোলাপি পাথরের এই ভাঙা গেট দেখলেই মন হালকা হয়ে যায়, ওরছার লোকেরা বলে 'শাহী দরওয়াজা' (Royal Gate)।

একটু দাঁড়ালাম! নিঃশ্বাস নেব বলে আর কী! মনে হল দূর থেকে ধ্রুপদী সংগীতের আওয়াজ ভেসে আসছে, গলাটা চেনা, গহরজান। গহরজানের কণ্ঠস্বর!

গহরজান তখন বিখ্যাত গায়িকা, মহারাজ ভবানী সিংহ বাহাদুর একবার গহরজানকে 'দাতিয়া-ওরছা'-তে অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ জানালেন, দৈনিক দু'হাজার টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। সময়টা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সঙ্গীতদুনিয়ায় শীর্ষে থাকা গওহর, সামান্য এক দেশীয় রাজার রাজ্যে অনুষ্ঠান করবেন! প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজাও ছাড়বেন না, যুবরাজের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানটাই তো মাটি হয়ে যাবে তাহলে। অবশেষে মহারাজ ভবানী সিংহ বাহাদুর সমর্থ হলেন গওহরকে রাজি করাতে। গওহর এলেন দাতিয়া-ওরছা-তে, সঙ্গে একশো এগার জনের দল, দশ জন ধোপা, চারজন নাপিত, কুড়িজন খিদমদগার বা আরদালি, পাঁচজন দাসী, পাঁচটা ঘোড়া, পাঁচজন সহিস, আর বাকিরা হল গওহরের বাজনদার, রূপচর্চার সঙ্গী এমন অনেকে। হবে নাই বা কেন, গওহর তো বেড়ালের বিয়ে দেন দৈনিক বারো হাজার টাকা খরচা করে! এদিকে চার দিন, পাঁচ দিন, এক সপ্তাহ হতে চলল - মহারাজা কিন্তু গওহরকে ডাকেন না গান গাইবার জন্য! কিন্তু প্রতিদিন দু হাজার টাকা পারিশ্রমিক ও উপহার পাঠাতে ভুলছেন না। গহরজান একদিন লুকিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। ওইরকমের দাম্ভিকতা তাঁর মতো শিল্পীকে মানায় না। শোনা যায় গহরজান এরপর তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান করেন এই "দাতিয়া-ওরছা" তে।

অভিমিতা, মানে আমার মেয়ে বলে উঠল, 'বাবা দাঁড়িয়ে পড়লে যে, কী ভাবছো? চল এগোই।'

একটু এগিয়ে বাঁ দিকে চোখে পড়ল আথাপুলা (Athapula) ব্রিজ। ড্রাইভার বলল, এই রাস্তা চলে গিয়েছে রাজমহল ও জাহাঙ্গীর মহল-এর দিকে।

এবারে আমার স্ত্রী সুমিতার একের পর এক প্রশ্ন - 'এখানে তো কোনো গাইড দেখছি না! কোথায় কোথায় ঘুরব? কী কী দেখব? তুমি কিছু জানো নাকি?'

আমার হয়ে অভিমিতাই উত্তর দিল, 'বাবাকে তো মনে হচ্ছে ইতিহাসের জগতে ঢুকে পড়েছে।'

বলতে শুরু করলাম - ওরছা-র দেখার জায়গাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় -

১) প্রাসাদ অংশ - জাহাঙ্গীর মহল, রাজমহল, শিসমহল আর রাই পরভীন মহল। ২) রামরাজা প্রাসাদ অংশ - রামরাজা মন্দির, চতুর্ভূজ মন্দির, দিনমান হরদয়াল প্যালেস, শাওন ভাদো। ৩) লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির ও সুন্দর মহল। ৪) বেতোয়া নদীর ধারে ছত্রী - এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য অসাধারণ। 'ওরছা' কথাটার মানে হল হল 'লুকোনো', পুরো শহরটাই লুকিয়ে আছে বেতোয়া নদীর কোলে, চারদিকে জীর্ণ পাহাড় আর মাথাতোলা জঙ্গল ঘিরে আছে ওরছাকে।

১৫৩১-১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমস্ত বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী ছিল ওরছা। রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহের হাত ধরে ১৫০১ সালে এই শহর গড়ে ওঠে। প্রায় সাড়ে চারশো বছর তাঁর বংশধরেরা ওরছা শাসন করেন। ১৯৫০ সালে মহারাজা দ্বিতীয় বীর সিং দেও-র সময় ওরছা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মাটিতে, প্রতিটি পাথরে, প্রতিটি ইটে ইতিহাসের গন্ধ লেগে আছে। ভাবলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

দূর থেকে কেল্লার চওড়া দেওয়াল দেখা দিল, পরিখার ওপর ছোট্ট ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি পাহাড়ে উঠছে, দুপাশে পাথরের পাঁচিল, আরও কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে, বড় চাতালে এসে গাড়ি থামল।

বাঁদিকে রাজমহল, ডানদিকে জাহাঙ্গীর মহল, মাঝখানে শিসমহল - এখন মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজমের হেরিটেজ হোটেল হয়েছে।

মেয়েকে বললাম, দেখ, পেছনের ঢাল, জঙ্গলে মিশেছে, ওদিকে হয়তো কোথাও বয়ে যাচ্ছে বেতোয়া নদী! দেখা হবে নিশ্চয়! খুব ইচ্ছে ছিল এই পরিবেশে থাকার, তোর মা তো আর হেরিটেজ হোটেলে থাকবে না! সঙ্গে সঙ্গে সুমিতা বলে উঠল, 'তুমি থাকলে না কেন? আমি থাকব না বলেছিলাম এই তো!' অভিমিতা মধ্যস্থতা করে আমাকে খানিক সান্ত্বনার সুরেই বলল, 'শিসমহলের কাচের দেয়াল, সরু স্তম্ভ আর 'হেরিটেজ লুক', ব্যাপারটা খারাপ হত না?'

অতঃপর হাঁটতে হাঁটতে আবার ইতিহাসের কাহিনিতে ফিরি - ১৬শ শতাব্দীর থেকে ওরছার ইতিহাস এক রোমাঞ্চকর বাঁক নেয়। সে সময় আগ্রা মুঘলশক্তির কেন্দ্র, সেখানকার ঘটনার সঙ্গে জুড়ে যায় ওরছা। দাক্ষিণাত্যে সম্রাট আকবর বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না! খান্দেসের সুলতান আকবরকে সাহায্য করতে রাজি নন! ফিরে গিয়েছেন বুরহানপুর দুর্গে। কয়েকমাস পরে আবার আকবর দাক্ষিণাত্য অভিযানে বেরোলেন। এদিকে ছেলে সেলিম আনারকলির প্রেমে পড়েছেন, জাঁহাপনা মোটেই খুশি নন! উপদেষ্টা আবুল ফজল আকবরকে পরামর্শ দিলেন উত্তরাধিকার থেকে

সেলিমকে বাদ দেওয়ার! ১৬০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সেলিম বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। আগ্রা দখলের চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়ে এলাহাবাদে এলেন। আবুল ফজলের পরামর্শের কথা সেলিমের কানে গিয়েছিল। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে আবুল ফজলের সঙ্গে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন আকবর, উদ্দেশ্য পুত্র সেলিমের বিদ্রোহ দমন। বদৌনি হয়ে বাহিনীর যাওয়ার কথা। এই সময় ওরছার রাজা মধুকর শাহের পুত্র বীর সিং জুদেও বদৌনি-র সামরিক প্রধান, সেলিম তাঁকে আবুল ফজলের বাহিনীকে আক্রমণ করার অনুরোধ জানালেন,বীর সিং জুদেও শুধু আক্রমণ করলেন তা নয়, আবুল ফজলের 'মাথা' কেটে সেলিমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন! সেই থেকে দুজনের বন্ধুত্ব হয়। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর, সেলিম হলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর! আর ওরই কিছুকাল আগে ১৫৯২ সালে ওরছার রাজা হন বীর সিং জুদেও। তৈরি করতে শুরু করলেন জাহাঙ্গীর মহল, স্বপ্ন ছিল বন্ধু জাহাঙ্গীর একদিন দিল্লির সম্রাট হবেন ও এখানে এসে থাকবেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হলেন, কথা রেখেছিলেন বন্ধুর অনুরোধের, এসেছিলেন ওরছার জাহাঙ্গীর মহলে, ছিলেন এক রাত!

জাহাঙ্গীর মহল

ভাবতে রোমাঞ্চ হচ্ছিল, আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে একদিন এসেছিলেন ভারতের সম্রাট জাহাঙ্গীর!! মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী থ্রিল হচ্ছে না!
অভিমিতা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বাবা, গহরজান যখন এসেছিলেন, তখন কি উনি এখানেই ছিলেন?' এই সম্বন্ধে ইতিহাসে কিছু পাইনি, শুনেছি, ওরছার কোনও বিলাসবহুল প্রাসাদে রাখা হয়েছিল।
কয়েকতলা নিয়ে জাহাঙ্গীরের প্রাসাদ, অসংখ্য ঘর আর সিঁড়ি, ওই খাড়া সিঁড়ি ওঠা সহজ না হলেও, ওঠানামার কিন্তু একটা মজা আছে। কিন্তু এবার কন্যার মায়ের গলায় আতঙ্ক, 'অত সিঁড়ি কী করে ভাঙব, হাঁটুর ব্যথাটা বড্ড ভোগাচ্ছে যে!'
সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, এই প্রাসাদ কিন্তু আধুনিক প্রাসাদের মতো নয়, ঘরের ভেতরে দেখার কিছু না থাকলেও ঘর থেকে ঘরে, ঘুরতে ঘুরতে, প্রাসাদের এক নিজস্ব পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘরগুলো বড় না হলেও অনেক জানলা, আলো হাওয়ার অভাব নেই! ভেতরের মহলে গম্বুজ, বারান্দা আর ছত্রীর ছড়াছড়ি। আসলে জাহাঙ্গীর মহল ধীরে সুস্থে দেখার জায়গা, এখানকার বাতাসে অদ্ভুত এক ম্যাজিক আছে। ধরতে সময় লাগে কিন্তু সেই জাদু উপভোগ করার মত।
আবার ইতিহাসে ফিরি। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ, ওরছার তৎকালীন মহারাজ জুঝড় সিং, অগ্রাহ্য করলেন তৎকালীন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আদেশ, সম্রাট পাঠালেন তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবকে। জুঝড় সিংকে হারিয়ে ওরছার রাজা করলেন দেবী সিংকে! এই জাহাঙ্গীর মহলেই আওরঙ্গজেব মুঘল পতাকা ওড়ালেন! কয়েকটা বছরের মধ্যেই মুঘলদের সঙ্গে ওরছার সখ্যতা, শত্রুতাতে পরিবর্তন হয়ে গেল! ইতিহাসের পাতা কখন যে কী ভাবে পাল্টায়, কেই বা বলতে পারে! মহারাজ জুঝড় সিং ছিলেন হরদৌল সিং-এর ভাই। সেই লালা হরদৌল, যাঁর রচিত লোকগীতি এখনও সারা বুন্দেলখন্ডে ছড়িয়ে আছে। ওরছার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে আজও শোনা যায় তাঁর গান - সে এক অন্য ইতিহাস।
একটা জানলার ধারে গিয়ে একটু বসলাম। বাইরে তাকিয়ে মুগ্ধ হই - শান্তি আর সৌন্দর্যের এমন মিলন! বুন্দেলখণ্ডের ওই ঢেউ খেলানো প্রান্তর, আর তার সঙ্গে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বনের সরল সৌন্দর্য - মিলে মিশে একাকার।

মহল থেকে ওরছার দৃশ্য

জাদুবলে যেন ফিরে গেলাম অতীতে - মনে হয়, ওই তো! ওই তো! বুন্দেলখণ্ডের সৈন্যরা চলেছে ঘোড়া ছুটিয়ে, আর চেঁচিয়ে বলছে, "জয় বুন্দেলও! জয় বুন্দেলও! জয় বুন্দেলও!" জাহাঙ্গীর মহলের চাতালে এসে দাঁড়ালাম - এখানেই তো নর্তকীরা জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের মনোরঞ্জন করতেন, চোখ বন্ধ করে ফেললাম, কানে ভেসে এল যেন নর্তকীর পায়ের নুপুরের রিনিরিনি শব্দ!!
শিসমহলের পাশে যে প্রাসাদটা আছে, তার নাম রাজমহল। ওরছা শহর প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিং। সময়টা ১৫০১ সাল। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজমহল তৈরির কাজ শুরু করলেও শেষ করে যেতে পারেননি। ওরছার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা মধুকর শাহ-এর আমলে এই মহলের কাজ শেষ হয়। তবে জাহাঙ্গীর মহল ও রাজমহলের স্থাপত্যরীতিতে বেশ ফারাক আছে। খেয়াল করলে দেখা যায়, রাজমহলে কোনো গম্বুজ নেই। বোঝাই যায় যে এই প্রাসাদ জাহাঙ্গীর মহলের অনেক আগে তৈরি হয়েছিল। রাজমহলের প্রধান আকর্ষণ রাজা আর রানি মহলের ফ্রেস্কো। দেখা যায় নানা রঙে আঁকা বুন্দেলি দেওয়াল চিত্র। রাজা মধুকর ছিলেন কৃষ্ণের ভক্ত, তাঁর ঘরের দেওয়ালে রয়েছে কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন কাহিনির ছবি। অন্যদিকে রানি গণেশ কুমারী রামভক্ত, ফলে তাঁর ঘরে রামায়ণের গল্পে দেওয়াল ভরা।

এগিয়ে চললাম প্রাসাদের দরবার-ই-আম আর দরবার-ই-খাস দেখতে। "দরবার-ই-খাস" হল খাস অর্থাৎ বিশেষ কক্ষ - মন্ত্রী-আমলার সঙ্গে রাজার ব্যাক্তিগত আলাপ-আলোচনার জন্য, আর "দরবার-ই-আম" মানে রাজা যেখানে সাধারণ মানুষ আমজনতার সঙ্গে দেখা করতেন। গাইড বললেন, 'সাহেব, ওই যে দেওয়ান-ই-আম-এর ওপেন স্টেজটা দেখছেন, ওখানে রাজনর্তকীরা নাচতেন। গানের জলসা বসত এখানে। এখন এম পি ট্যুরিজমের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয়।' রাজমহলের দেওয়াল ঘেঁষে যে রাস্তাটা পূর্বদিকে এগিয়েছে, চললাম সেদিকে। চোখে পড়ল বাঁদিকে

কিছু পুরনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, ওগুলো নাকি ছিল মহারাজাদের হামাম। আর বাগান আর ফোয়ারা পেরিয়ে চোখে পড়ল একটা দোতলা প্রাসাদ, ওর নাম রাই পরভীন মহল। ওই প্রাসাদকে ঘিরে রয়েছে এক উজ্জ্বল ইতিহাস আর প্রেমের গল্প! আসলে সমগ্র বুন্দেলখন্ডেই প্রেমের নানা কাহিনি ছড়িয়ে আছে। গোয়ালিয়রের গুর্জরী মহলের রানী মৃগনয়নী আর রাজা মান সিং-এর মধ্যে। আর ওরছাতে রাজা ইন্দ্রজিতের সঙ্গে রাই পরভীন-এর। দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায়, কে যেন ফিসফিস করে বলছে - "ও আমার রানী পরভীন,/ তোমার সৌন্দর্য যেন, ভগবানের সুগন্ধ!/ এ যেন স্বর্গ ও শয়তানের মধ্যে সেতু,/ তোমার মুখের শব্দ, যেন গঙ্গার জল।"

ঘর জুড়ে বুন্দেলি চিত্রকলা

রাই পরভীন মহলের দিকে এগোতে থাকলাম। রাই পরভীন ছিলেন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী, গায়িকা, কবি ও অসম্ভব সুন্দরী। ঘোড়া চালনাতেও খুব দক্ষ ছিলেন। ১৫৬০ সাল, মহারাজ মধুকর শাহ-এর পুত্র যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ প্রেমে পড়লেন রাই পরভীন-এর। যুবরাজ গড়ে তুললেন রাই পরভীন মহল। গান-প্রেম, আর নূপুরের রিনিঝিনিতে ভেসে যেতে লাগল এই প্রাসাদ! সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে রাই পরভীন-এর খ্যাতি! প্রেমের আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হল! সম্রাট আকবরের কানে গেল রাই পরভীন-এর সৌন্দর্যের কথা। বাদশাহ তাঁকে দেখতে চাইলেন, ছুটে এল মুঘল দূত রাজা মধুকর শাহ-এর দরবারে। রাই পরভীনকে পাঠাতে হবে মুঘল দরবারে! ইন্দ্রজিৎ কী করে মেনে নেবেন তাঁর প্রিয় রাই পরভীনকে অন্য পুরুষের কাছে পাঠানোর কথা! হোক না তিনি দিল্লির বাদশাহ! অগ্রাহ্য করলেন বাদশাহের অনুরোধ! সম্রাট ক্ষেপে লাল! এত সাহস! এক কোটি টাকা জরিমানা করলেন! অনিচ্ছা সত্বেও ইন্দ্রজিৎ রাই পরভীনকে পাঠালেন আগ্রাতে। রাই পরভীন মহলের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে রাই পরভীন আর ঘোড়ার পিঠে সওয়ারি যুবরাজ ইন্দ্রজিতের পূর্ণ মুরাল, বুন্দেলি শিল্পের এক চরম নিদর্শন, যা সারা ওরছাতে আর কোথাও নেই।

সম্রাট আকবর তো এদিকে রাই পরভীনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়লেন। দিন কাটে, রাই পরভীন ফিরতে পারছেন না। মন খারাপ হয়। শেষে আকবরকে দু'লাইন লিখে পাঠালেন, যার অর্থ - আপনি সারা দুনিয়ার বাদশাহ, আমার স্পর্ধা মার্জনা করবেন, কাক ,শকুন আর ভিখারি অন্যের খাওয়াতে ভাগ বসায়, সারা দুনিয়ার বাদশার কি সেই আচরণ সাজে! - সম্রাট পত্রপাঠ রাই পরভীনকে ওরছা পাঠিয়ে দিলেন। মহলে আরও কিছুক্ষণ কাটালাম। ঘরগুলো বিভিন্ন তলায়, ঝুলবারান্দায় গাছের ডাল, দেওয়ালের ছবি, সব মিলিয়ে এক মনোরম পরিবেশ।

ওরছায় সৌধের বাতাবরণের স্বপ্নিল ভাবের সঙ্গে আশ্চর্য সাযুজ্য আছে আশেপাশের বন্য পরিবেশের। সব মিলে এমন এক মাধুর্য সৃষ্টি হয় যার অনুভব অস্বীকার কঠিন।

রাই পরভীন মহল থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে আরও এগোলে প্রাচীন শিব মন্দির, পরিষ্কার জনশূন্য রাস্তা, শান্ত, দেওয়ালে হলদে আর খয়েরি রং দিয়ে বুন্দেলি ছবি আঁকা। চলেছি শহর থেকে একটু দূরে লক্ষীনারায়ণ মন্দির দেখতে। ওরছা শহর পায়ে হেঁটে ঘুরলে, তবেই তার ঠিক মাদকতা অনুভব করা যায়। পৌঁছলাম লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে। রাজা বীর সিং-এর আমলে এটি তৈরি হয়। দুর্গ ও মন্দিরের মিশ্রণ বলা চলে। বুন্দেলি স্থাপত্যের একটি অনন্য নিদর্শন। চুন, পাথর আর ইট দিয়ে তৈরি এই মন্দিরে, কামান রাখার জায়গা পর্যন্ত আছে! মন্দিরে বরং কোনও মূর্তি নেই। গর্ভগৃহের চারপাশে খোলা বারান্দা, বারান্দার ছাদগুলি ফ্রেস্কো দিয়ে ঢাকা। কালের নিয়মে কোথাও তার রঙ ফিকে হয়ে এসেছে, কিছুটা ইচ্ছে করেও নষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু অনেক ছবি এখনও বেশ ভালো আছে। রামায়ন, মহাভারত, কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন কাহিনি, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, ১৮৫৭ সালে ঝাঁসির রানীর যুদ্ধ - সবই আঁকা আছে। ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেকটা সময় লেগে গেল।

রামরাজা মন্দিরের প্রবেশপথ

আজ ওরছাতে যে রামরাজা মন্দির দেখা যায় তা ছিল তৎকালীন সময়ে রাজা-রানির বাসস্থান। এর গঠনও ঠিক মন্দিরের মতো নয়। অন্যদিকে বিশাল চতুর্ভূজ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল রামের মূর্তি রাখার জন্য। রাজা মধুকর শাহ এটি তৈরি করান। এত বড় মন্দির ওরছাতে আর নেই। উঁচু ছাদ, বড় বড় ছত্রী, শিখর আকাশ ছোঁয়া! লম্বা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠা যায়। পরে রাজা এখানে বিষ্ণুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যদিও সেই মূর্তিও এখন আর নেই। এই নিয়ে স্থানীয় গল্পকথা রয়েছে।

বেলা ফুরিয়ে আসছে, গোধূলি আসন্ন। চলে এলাম বেতোয়া নদীর ধারে। এই সেই বেতোয়া নদী, কত ইতিহাসের সাক্ষী! কলকল করে বয়ে চলেছে, ছড়িয়ে আছে পাথর, নদীর বুকে। বিন্ধ্যপর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে বেতোয়া গিয়ে মিশেছে যমুনাতে। ঘাটের নাম 'কাঞ্চন ঘাট।' নদীর পাড়ে চোখে পড়ে মন্দিরের মতো কিছু ছত্রী। সেই দিকেই এগোলাম। আসলে এইগুলো বুন্দেল রাজাদের স্মৃতিসৌধ, সার বেঁধে একই চত্বরে রয়েছে। এক একটি ছত্রী এক একজন রাজার নামে। প্রথমে একটি উঁচু বেদি তারপর তিনতলা সৌধ, ওপরে ছাদের চার কোনায় চারটি শিখর। কোনোটা বীর সিংহ দেও-র, কোনোটা মধুকর শাহ-এর, বাদ বাকি ছত্রীগুলো ভারতী চাঁদ, পাহাড় সিং, সাওয়ান্ত সিং, উদয়াৎ সিং এমন নানা নামের। মধুকরের ছত্রীতেই একমাত্র গণেশ মূর্তি রাখা আছে।

১৫৫৪ সাল, রাজা মধুকর শাহ তখন ওরছার শাসনকর্তা। তাঁর সময়ে ওরছা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। দিল্লির সিংহাসনে তখন আসীন মুঘল সম্রাট আকবর! সম্রাট ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, ওরছার জঙ্গলে সিংহ শিকার করবেন। কিন্তু রাজা মধুকর শাহ অনুমতি দিলেন না। এত স্পর্ধা একজন দেশীয় রাজার! সম্রাট আকবর আক্রমণ করলেন ওরছা! ১৫৭৭ সালে প্রবল যুদ্ধে রাজা মধুকর শাহ প্রবল পরাক্রমে প্রতিহত করলেন

আকবরকে। ১৫৮৮ সালে সম্রাট আকবর আবার আক্রমণ করলেন ওরছা! এবার কিন্তু সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেন না রাজা মধুকর শাহ। হেরে গিয়ে নারোয়ার পাহাড়ে পালিয়ে গেলেন। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হল রাজা মধুকর শাহ-র। ছত্রীর বাগানে ঘুরতে ঘুরতে নদীর জলের শব্দ কানে আসছিল। গাইডকে বললাম, চলুন একটু বসি নদীর ধারে। সূর্য ডুবছে - আকাশ গোলাপি। পর্যটকের ভিড় নেই তেমন। নদীর ধারে বড় বড় পাথর ছড়িয়ে আছে। আকাশের রঙ জলে পড়েছে, জলে ভেসে আসছে ছত্রীর ছায়া! তিরতির করে বয়ে যাওয়া সেই স্রোতে, সেই রঙ আর ছায়া কাঁপছে!
গাইড গুনগুন করে উঠলেন, লখনৌ-র নবাব ওয়াজিদ আলি সাহেবের সেই বিখ্যাত গানের কলি, 'বাবুল মোরা, নইহার ছুটো হি যায়ে...।'

রাজা মধুকর শাহ-এর ছত্রী

~ *ওরছার তথ্য* ~ *ওরছার আরও ছবি* ~

অভিজিৎ চ্যাটার্জী পেশাগত ভাবে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। আর নেশা ভ্রমণ। নেশার তাগিদে ঘুরে বেড়িয়ে নির্মাণ করেন পর্যটনকেন্দ্রগুলি নিয়ে বিভিন্ন ট্রাভেল ডকুমেন্টারি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

নীল পাহাড়, অর্কিড আর আত্মঘাতী পাখিদের দেশে

সুদীপা দাস ভট্টাচার্য্য

~ হাফলং-জাটিঙ্গার আরও ছবি ~

দক্ষিণ আসামের শহর শিলচর থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথে চলেছি আসামের একমাত্র শৈল শহর হাফলং ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদ জাটিঙ্গার উদ্দেশ্যে। আসামের ডিমা হাসাও জেলায় অবস্থিত এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলে ঘেরা এই জনপদ দুটির উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৩০০০ ফুট। যাত্রাপথের অনেকটাই উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলের গভীর জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। আগে এই রেলপথটি মিটার গেজ ছিল; সম্প্রতি ব্রডগেজ চালু হয়েছে। ট্রেন একের পর এক ছোট বড় অন্ধকার টানেল আর অজস্র উঁচু উঁচু ব্রিজ পেরোচ্ছে। কোথাও রেললাইনের গা ঘেঁষে উঠে গেছে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল; কোথাও আবার নীচে উচ্ছল জাটিঙ্গা নদী ঘন জঙ্গলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে; কখনও আবার কোথা থেকে হঠাৎ ভেসে আসা কুয়াশার মত মেঘ উড়ে যাচ্ছিল বর্ষা-ভিজে সবুজ পাহাড়-জঙ্গলের গা বেয়ে। শিলচর থেকে নিউ হাফলং স্টেশনের ঘন্টা পাঁচেকের যাত্রাপথটিতে এমন অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতেই কেটে যাওয়ার কথা; কিন্তু প্রাকবর্ষার বৃষ্টিতে ধ্বসের জন্য ট্রেন লেট হয়ে বিকেল হয়ে গেল নিউ হাফলং পৌঁছতে। একেবারে শেষে ট্রেনটা প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ একটা টানেল পেরোল। স্টেশনে নেমে বাইরে এসে অটো ভাড়া করলাম। স্টেশন অনেক নীচে আর হাফলং শহর পাহাড়ের ওপর। অটোরিক্সা ছাড়া আর কোনও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই। অন্ধকার পাহাড়ি পথে উঠতে শুরু করল অটো। প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়ায় আমরা জবুথবু; শহরের মধ্যে কিছু জায়গায় রাস্তাও বেশ খারাপ; প্রায় মিনিট কুড়ি পর অটো 'হোটেল এলিট' পৌঁছে দিল। হোটেলটা বড় রাস্তার ওপরেই; ঘরগুলো বেশ পরিষ্কার আর আরামদায়ক; সারাদিনের ট্রেনযাত্রার ধকলে ক্লান্ত ছিলাম, তাই পরেরদিনের জন্য একটা অটোরিক্সা বুক করে তাড়াতাড়ি রাতের খাবারের অর্ডার দিয়ে দিলাম।

সকালে উঠে দেওয়ালজোড়া জানলার পর্দা সরাতেই সামনের বাড়িঘর ছাপিয়ে চোখে পড়ল মেঘে অর্ধেক ঢাকা গুরুগম্ভীর বরাইল পাহাড়ের রেখা। অটোরিক্সা হাজির; সকালের খাবার প্যাক করিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জাটিঙ্গার পথে। সকালের আলোয় হাফলং শহরটাকে দেখতে দেখতে চলেছি। ছোট পাহাড়ি শহর; দোকানপাট এরই মধ্যে খুলে গেছে; রাতে বৃষ্টি হয়েছে বলে চারপাশ ভেজা ভেজা, ঠান্ডা; রাস্তার পাশের বড় গাছ থেকে বাহারি অর্কিডের গোছা ঝুলছে। কিছুটা যাওয়ার পর অটো লোকালয় ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় পড়ল। রাস্তার একপাশে পাহাড়ের গায়ে অজস্র চেনা অচেনা ফুল ফুটে আছে; আর অন্যদিকে জঙ্গলের ফাঁকে অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে রেললাইন, একটা ছোট্ট রেলব্রিজ আর নিউ হাফলং স্টেশনটা। এখানেই রাস্তার ওপর রেলিং দিয়ে ঘেরা জননেত্রী ও স্বাধীনতাসংগ্রামী রানি গাইদিনলিউ-এর মূর্তি। ভিউ পয়েন্টে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অটো আবার চলল। রাস্তা কোথাও বেশ সরু আর অসমতল; প্রচণ্ড ঢালু রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে অটো চলেছে; কিছুটা গিয়ে অবশেষে শিলচর-হাফলং জাতীয় সড়কে পড়া গেল। এবার রাস্তা ভাল। ঠান্ডা হাওয়া আর ঝলমলে রোদ তার সঙ্গে সঙ্গত করছে। রাস্তার দু-পাশে ঘন জঙ্গল, বাঁশগাছ; ফাঁকা রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে কাজে চলেছে স্থানীয় উপজাতীয় মেয়ে-পুরুষ; তাদের মাথা থেকে পিঠে ঝুলছে বেতের বড় বড় টুকরি, হাতে দা; অটো থামিয়ে নেমে পড়ে সেই বেতের টুকরি মাথায় আমরা ছবি তুললাম। সামনেই জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট্ট পাহাড়ি ঝোরা; বাঁশের ফাঁপা চোঙ দিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে নিয়েছে গ্রামের মানুষ। পথের একপাশে উজ্জ্বল নীল রঙের বুনো ফুল ফুটে রয়েছে; এছাড়াও হাজারো ফুল আর প্রজাপতির মেলা; এরই মধ্যে পাহাড়ের ঢালে কমলালেবুর ক্ষেতে প্রচুর লেবু ফলেছে। জঙ্গলের গন্ধমাখা নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি চুপচাপ; হঠাৎ নির্জনতা খান খান করে পাহাড়ের আরও ওপর থেকে ভেসে এল পরপর 'হুকু হুকু হুক্কু' ডাক! আগে অরুণাচল প্রদেশ গিয়ে এই ডাকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল - হুলক গিবন; আমাদের অটোচালক দাদার ভাষায় হুকু বাঁদর। ঘন জঙ্গল আর অনাবিল প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে হুলক গিবনের ডাক শুনতে বেশ লাগছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর অটো পৌঁছল 'এথনিক ভিলেজ'। জাটিঙ্গার এই অবশ্যদর্শণীয় স্থানটি ডিমা হাসাও জেলার বনদপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে; চারপাশের পাহাড়ের বুকে একটুকরো সমতল জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এথনিক ভিলেজটি এই অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং জীবনশৈলীকে মেলে ধরেছে পর্যটকদের সামনে। বাঁশ, বেত, পাইন এবং আরও নানা গাছে ছাওয়া সবুজ ভিলেজের মধ্যে পরপর তৈরি করা কুকী, মার, গাংতে, রাংখোল, ভাইফে, ডিমাসা প্রভৃতি বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতীর বসবাসের কুটীর; এগুলির উপকরণ মূলত

বাঁশ ও বেত; প্রতিটা কুটীর গড়নে এবং ছাঁদে আলাদা আলাদা; অনেক কুটীরের ভেতর উপজাতীয় মানুষদের ব্যবহার্য বেতের ঝুরি, টুকরি, বাঁশের জলপাত্র এসব রাখা। এর মধ্যে রংমাই নাগা, দেকিচাং-দের কুটীরগুলো বেশ অভিনব লাগল; রংমাই নাগা কুটীরটি কাঠের; তার ওপর রং দিয়ে গাছ, মানুষ, পশুপাখি এবং আরও বিভিন্ন নক্সা আঁকা; দেখতে দেখতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের গুহাচিত্রের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ভিলেজের মাঝখানে মাইবঙের উপজাতীয় রাজাদের পাথরের বাড়ির একটি প্রতিরূপ; তার সিঁড়ির ধাপে বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে ভিলেজের অন্য দিকে চললাম। এদিকটায় ঘন আনারসের ক্ষেত; ছোট ছোট আনারস ধরেছে সবে; বেত-এর ফলও এই প্রথম দেখলাম এখানে; পাশেই আবার পাম জাতীয় ছোট ছোট গাছের গায়ে থোকায় থোকায় দুলছে সাদার ওপর বেগুনী বুটি শৃগাল-লাঙ্গুল(Fox-tail)অর্কিড। ভিলেজের পাশেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বিশাল

এক সুসজ্জিত বাগান, রংবেরঙের মরশুমি ফুলে সাজানো; বাগানের মধ্যে বাচ্চাদের খেলার জন্য দোলনা, ঢেঁকি, স্লিপ, মেরি গো রাউন্ড সব রয়েছে; আর বড়দের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এখানে ওখানে বাঁশ দিয়ে তৈরি টুকটুকে লাল আর গাঢ় সবুজ ছাউনি। ভিলেজকে চারদিক দিয়ে ঘিরে যেন হাতের নাগালে এসে দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের সারি। লাল-সবুজ ছাতার তলায় ঠান্ডা ছায়ায় বসে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কত সময় যে কেটে গেছে খেয়াল নেই। অটোচালক দাদার ডাকে সম্বিত ফিরল। এবার চললাম জাটিঙ্গা বার্ড ওয়াচ টাওয়ারে।
আত্মঘাতী পাখিদের জন্য জাটিঙ্গা বিশেষ ভাবে খ্যাত। প্রতি বছর বর্ষাশেষের কোনও কোনও কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাতে পরিযায়ী পাখিরা ধীরে ধীরে ডানা মেলে নেমে আসে আলোকরশ্মির আকর্ষণে; আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তাদের সেই দলবদ্ধ মৃত্যুবরণের ঘটনা আজও যেন এক গা ছমছমে রহস্যে মুড়ে রেখেছে জাটিঙ্গাকে। টাওয়ারে ওঠার মুখে একটা ফলকে লেখা 'Welcome the coming birds…Let Them Live and Add Attraction to The Jatinga Valley…।' একসময় এই ক্লান্ত, দিগভ্রান্ত পাখিরা ছিলো স্থানীয় উপজাতিদের শিকার; পক্ষী এবং পরিবেশপ্রেমীদের হস্তক্ষেপে এখন জনসচেতনতা কিছু বেড়েছে। এখন পাখি আসার সময় নয়, খালি ওয়াচ টাওয়ারটি দেখেই অতৃপ্ত মন নিয়ে ফিরলাম।

অটো এবার নিয়ে চলল খাসিয়া বসতির মধ্যে দিয়ে স্থানীয়রা যাকে বলে খাসিপুঞ্জী। খাসিয়ারা মেঘালয়ের জনগোষ্ঠী, কিন্তু ছড়িয়ে আছে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও। রাস্তার দুপাশে পাহাড়ের গায়ে খাসিপুঞ্জীর বাড়িগুলো কাঠের; কাচের জানলায় সুন্দর লেসের পর্দা দুলছে; বারান্দায় টবে রংবেরঙের ফুল; ঝকঝকে তকতকে চারদিক, রাস্তাঘাট। আবর্জনা দেখে অভ্যস্ত আমাদের শহুরে চোখ আর মন রীতিমতো লজ্জা পাচ্ছিল প্রত্যন্ত এই গ্রামের রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি দেখে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম পাহাড়ের বেশ খানিকটা উঁচুতে বিশাল মাঠের মতো একটা খোলা জায়গায়। মাঠটায় দুদিকে গোলপোস্ট পোঁতা; একদিকে একটা তিনতলা ওয়াচ টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ারটা এমন জায়গাতেই বানানো যে এখান থেকে একদিকে তাকালে দেখা যাবে উত্তর কাছাড় বরাইল পাহাড়ের নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণী আর অন্যদিকে প্রায় পুরো হাফলং শহরটা। টাওয়ারের তিনতলায় উঠে যখন দাঁড়ালাম, মনে হল এখানে না এলে জাটিঙ্গার সৌন্দর্যের অনেকটাই অদেখা থেকে যেত। টাওয়ারটা মাঠের একপ্রান্তে পাহাড়ের কিনারে; পিছনদিকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে পাথুরে খাদ; দূরে পিছনের পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে আছে বাড়িঘর, চার্চ, হাফলং শহর। আর টাওয়ারের সামনে মাঠের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে মেঘ জড়ানো বিস্তীর্ণ, গম্ভীর নীল পাহাড়।
জাটিঙ্গা থেকে হোটেলে ফিরতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। দুপুরে খাওয়া হয়নি কারণ পুরো পথে ছোটখাটো চায়ের দোকান ছাড়া কোথাও তেমন খাবারের দোকান নেই। তাই ওই বিকেলবেলাতেই হোটেলের কাঁচালঙ্কা ছড়ানো ঝাল ঝাল চিকেনকারি আর ভাত দিয়ে লাঞ্চ সারা হল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম দূরের পাহাড়ের মাথার মেঘগুলো যেন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। হোটেলের ম্যানেজার বললেন এই জায়গাটার এই মজা; প্রাকবর্ষার এই সময়ে রোজ রাতে ঝমঝম বৃষ্টি আর সকাল হলেই মেঘ উধাও হয়ে ঝলমলে রোদ। আমাদের ইচ্ছা ছিল কাছাকাছি দোকানবাজার একটু পায়ে হেঁটে ঘুরে আসার; কিন্তু আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় আজকের মত আপাতত বিশ্রাম নেওয়াই স্থির করলাম। আগামীকালের দ্রষ্টব্য হাফলং শহর।

আমাদের অটোচালক তালুকদারদাকে বলাই ছিল; ব্রেকফাস্ট করে একটু বেলায় বেরোলাম; প্রথম গন্তব্য হাফলং লেক। হোটেল থেকে বেশ কিছুটা নীচের দিকে নেমে পৌঁছলাম শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত হাফলং লেকের ধারে। চারপাশ সবুজে ঘেরা লেকটা প্রস্থে বেশি না হলেও দৈর্ঘ্যে বেশ অনেকটাই বড়। লেকের পাশ দিয়ে পরিচ্ছন্ন চওড়া রেলিংঘেরা রাস্তা, জামরঙা ফুলে ছাওয়া জ্যাকারান্ডা গাছের সারি। লেকের প্রধান অংশে টলটলে সবুজ জলের ওপর দিয়ে একটা সরু তারের ঝুলন্ত ছোট সেতু; সেতুর ওপর দিয়ে লেকের ওপারে গিয়ে কিছুটা হেঁটে আবার ফিরে এলাম এপারে রাখা অটোর কাছে। চললাম সার্কিট হাউস। সার্কিট হাউস যাওয়ার ঘুরপথে একে একে তালুকদারদা দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললেন ডন বস্কো স্কুল, প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ, হাফলং সরকারি কলেজ, আরও কত কী। এবার অটো সরু রাস্তায় ঘুরে ওপরে উঠতে শুরু করল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের পৌঁছে দিল পাহাড়ের ওপর সার্কিট হাউসের সামনে। একপাশে পুরোনো অসমিয়া ছাঁদের টিনের চালের বাংলো; গেটের দুদিকে বোগেনভিলিয়ার ফুলে ভরা গাছ; পাশেই নতুন দোতলা সাদা রঙের সার্কিট হাউস। চারদিক ঠান্ডা, নিস্তব্ধ। সামনে অনেকটা রেলিংঘেরা খোলা জায়গা আর সেই খোলা চত্বরটার শেষেই নীচে গড়িয়ে গেছে খাদ। রেলিং ধরে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে চোখে পড়লো বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ চড়াই-উৎরাই, অনেক নীচে বিছিয়ে থাকা রেললাইন আর তার ওপারে পাহাড়ের সারি। আরও এক অভিনব দৃশ্যে চোখ

আটকাল; উঁচু উঁচু থামের ওপর দিয়ে জঙ্গলের বুক চিরে চলে গেছে সাদা ব্রডগেজ রেলব্রিজ; আর তার পাশেই অনেক নীচে শুয়ে আছে একদা ব্যস্ত অধুনা পরিত্যক্ত ছোট্ট ন্যারোগেজ রেলরাস্তাটা; ঠিক যেন অতিকায় দৈত্য আর লিলিপুটের সহাবস্থান। বুঝতে পারলাম এই বিশেষ দৃশ্যটার জন্যই সার্কিট হাউস অবস্থানগতভাবে এত খ্যাত।

সার্কিট হাউস থেকে ইতিউতি ঘুরে হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সেরে একটু বিশ্রাম নেওয়া গেলো। বিকেলে পায়ে হেঁটে বেরোলাম স্থানীয় বাজারে। হোটেল থেকে অনেকটা নীচের দিকে নামলে বাজার; দোকানিরা পসরা সাজিয়েছে; সবজি থেকে সুপারি, মাছ থেকে পায়রা-মুরগি, কী নেই সে বাজারে! রাস্তার দুপাশেও সারি সারি জামাকাপড়, জুতো, টুপি, প্লাস্টিক সামগ্রীর দোকান। পথেই পড়ল বেশ বড় এক মন্দির; আরতি শেষে প্রসাদ বিলি হচ্ছে। টুকটাক কেনাকাটা করতে না করতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এল। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে একটা রেস্তোঁরায় ঢুকে বসলাম; জমাটি ঠান্ডার সন্ধ্যায় বৃষ্টি দেখতে দেখতে ধূমায়িত চাওমিন আর মুর্গিভাজা খেতে বেশ লাগছিল। বেশ খানিকক্ষণ পরে বৃষ্টি একটু ধরতে একটা অটো জোগাড় করে ফিরে এলাম হোটেলে। আগামীকাল সকালেই ফেরার ট্রেন; তাই দ্রুত গোছগাছ সেরে নেওয়া হল।

সকালের বৃষ্টিভেজা হাফলং-কে পেছনে ফেলে অটো নামছে পাহাড়ের ঢালু রাস্তায়, তখনও রোদ ওঠেনি। বরাইল পাহাড়ের মাথার সাদা মেঘগুলো আজ অনেক নীচে নেমে এসেছে, ওড়নার মতো ভেসে আছে পাহাড়ের বুকে, পাহাড়ি পথের প্রতিটা সতেজ সবুজ বাঁকে; যেন হাত বাড়ালেই মুঠোয় ধরা দেবে। হাফলং-এর স্নিগ্ধ মনোহর রূপ দু-চোখে মেখে স্টেশনে পৌঁছলাম। ট্রেন এলে তালুকদারদা ভিড় ঠেলে আমাদের সিটে বসিয়ে ব্যাগ বাঙ্কে তুলে দিয়ে নিচে নেমে দাঁড়িয়ে রইলেন যতক্ষণ না ট্রেন ছাড়ে।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। দু'দিনে আপন হয়ে যাওয়া ছোট্ট জনপদটা আর তার কিছু মানুষের উষ্ণ আতিথেয়তার তাজা স্মৃতি নিয়ে ট্রেনের জানলার বাইরে চোখ রাখলাম, সাদা মেঘগুলো থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টিদানা নেমে আসছে চারদিক ঝাপসা করে।

~ *হাফলং-জাটিঙ্গার আরও ছবি* ~

সুদীপা দাস ভট্টাচার্য্য পেশায় উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও গবেষক। ভালবাসা পরিবারের সঙ্গে বেড়ানো, গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়া এবং অল্পসল্প লেখালেখি। মনুষ্যনির্মিত ঝাঁ-চকচকে কীর্তি নয়, আকর্ষণ করে নির্জন উন্মুক্ত অনাবিল প্রকৃতি।

---

tell a Friend

ইতিহাসের মেবারে

হিমাদ্রি শেখর দত্ত

~ রাজস্থানের তথ্য ~ রাজস্থানের আরও ছবি ~

শিবরাত্রির ছুটির সঙ্গে শনি-রবি মিলিয়ে টানা তিনটে দিনের ছুটি নজরে আসতেই প্ল্যান বানাই একটা ছোটখাটো আউটিং-এর। বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর শরণাপন্ন হই, কিন্তু, কপাল মন্দ, বন্ধুপত্নীর শনিবারে ছুটি না থাকায় তারা দুঃখের সঙ্গে যেতে অপারগ জানিয়ে দেয়।

অগত্যা শুধু নিজেদেরই ব্যবস্থাই করি। এসি ভলভো বাসে আমেদাবাদ থেকে উদয়পুর (সাড়ে তিন ঘন্টার রাস্তা), যাওয়া আসার আগাম টিকিট করে নেওয়া গেল। যাওয়ার একদিন আগে ভোর ভোর মোবাইলের আওয়াজে লেট ঘুম (আটটা বাজে) ভেঙে গেল। বন্ধুপত্নীর গলা – 'দেখুন না, আগে বলেনি - এখন আমাদের শনিবারে ছুটি দিয়েছে। আপনাদের যাওয়ার তো সব কিছু বুক হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, তবুও আমরা কি চাইলে যেতে পারব?' গিন্নি ততক্ষণে তাঁর স্কুলে বেরিয়ে গেছেন - আমি তো বিছানায় উঠে বসি। 'সত্যি যাবে তোমরা? আমাদের বাসের টিকিট হয়ে গেছে, তবে সে মনে হয় পাওয়া যাবে। শুধু আগে হোটেলে কথা বলে দেখি, ঘর পাওয়া যাবে কিনা। আমি একটু পরে জানাচ্ছি।' 'হ্যাঁ, প্লিজ দেখুন।' হোটেলে ফোন প্রথমবারে কেউ তোলে না, দু তিন বার চেষ্টা করার পরে জনৈক বিক্রম সিং লাইনে এলেন – 'ও জী, আপ চলে আইয়ে, রুম কা বন্দোবস্ত হাতোঁ হাত কর দেঙ্গে - কোই প্রবলেম নেহি হ্যায়।' ব্যাস সব ফিট হয়ে গেল। বন্ধুকে ডেকে সুখবর দিয়ে দিই। ও তার নিজের জায়গা থেকেই ডাইরেক্ট উদয়পুর পৌঁছে যাবে এমন বাসে টিকিট কেটে নিচ্ছে বলে আমায় জানায়। ঠিক আছে, তাতে কোনও অসুবিধে নেই। উদয়পুরে মিট করছি তাহলে। এবার শ্রীমতীকে ফোন করি খবরটা দেওয়ার জন্যে। ফোনে কথাবার্তা শুরু হতেই, তার দিক থেকে প্রোপোজাল – 'তাহলে আর বাসে কেন, চল না সবাই মিলে গাড়িতে যাই। বেশি দূর তো নয়। বাসের টিকিট ফেরত দিয়ে দাও, আর সুদীপদাকেও বল, আজ রাতে আমাদের এখানে চলে আসতে - কাল ভোর ভোর বেরিয়ে পড়া যাবে।' আবার ফোন লাগাই - আর এই নতুন প্রস্তাবনার ঘোষণা করি। কী আশ্চর্য, সেটা সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়ে যায় অত্যন্ত আনন্দ আর খুশির সঙ্গে - ওদিককার রিঅ্যাকশন – 'আরে এটাই তো আমি চাইছিলাম। তোমার বাসের টিকিট কাটা বলে আমায় বাসের টিকিট কাটতে হচ্ছিল - এখনি সব ফেরত দিয়ে দাও। আমি মানে আমরা কাল সকাল আটটার মধ্যে তোমার ওখানে চলে আসছি - তোমাদের পিক আপ করে বেরিয়ে যাব। এখন ফোন ছাড়, আমায় গাড়ির পিইউসি করাতে যেতে হবে - স্টেট ক্রস করব, যদি ধরে তাহলে হেভি ফাইন হবে।' ও ফোন কেটে দেয়। মনে হচ্ছে এবার ট্যুরটা জমে যাবে।

পরের দিন সকাল সকাল উঠে আমরা সময়ের আগেই তৈরি হয়ে গেলাম। সাড়ে আটটা নাগাদ, নীল রঙের মারুতি এষ্টেলো নিয়ে বন্ধু আর বন্ধুপত্নী হাজির। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম - উদয়পুরের উদ্দেশ্যে। চালকের আসনে সুদীপ চৌধুরী, আমার কলিগ। আমরা ১৯৯৭ সাল থেকে বন্ধু। এখন দুজনেই রিটায়ার করেছি - ওরা বরোদায় বাসা বানিয়েছে, আমি আমেদাবাদে। কিন্তু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বটা এখনও সমান ভাবেই বজায় আছে। অনেক দিন পরে বেরোনো, অনেক দিন পরে আবার মুখোমুখি - তাই গল্প আর গাড়ি সমান তালেই চলতে থাকে। পথে হিম্মতনগর ছাড়িয়ে একটি রেস্তোরাঁ টাইপের দোকানে গরম গরম সিঙ্গাড়া আর দারুণ চা পাওয়া গেল। হিম্মতনগর শহরের কোনও খাবারের দোকান তখনও খোলেই নি - বলল, বেলা এগারোটার আগে কিছু পাওয়া যাবে না। মনে হয় আজ শিবরাত্রি বলে সকলেই ছুটির মেজাজে রয়েছে। সুদীপ সঙ্গে 'ভ্রমণ সঙ্গী' বইটা নিয়ে এসেছিল - পাতা উলটে উলটে কুম্ভলগড়ের ঠিকুজি বের করলাম। কুম্ভলগড় দুর্গের প্রাচীর বিশ্বের দ্বিতীয় লম্বা প্রাচীর, যা কিনা চায়না ওয়ালের পরেই - এই অসাধারণ ব্যাপারটা একেবারেই অজানা ছিল - সেই দুর্গ দেখতে যাচ্ছি - এটা মনে করে চলার পথের উৎসাহ আরও কিছুটা বেড়ে গেল। এখন কেবল একটাই ভাবনা, আমাদের ঘর তো হোটেল লে-রয়-এ বুক করা আছে - সুদীপরা ঠিকঠাক ঘর পেয়ে গেলেই ব্যস। রাস্তায় আর কোথাও দাঁড়ানো হয় নি - একদম হোটেলের দোরগোড়ায় এসে সুদীপ গাড়ি বন্ধ করে। লে-রয় হোটেলটা মোটামুটি বড়, ভালো করেই সাজানো। দুদিকেই ঢোকার দরজা আছে। হোটেলের ঠিক পাশেই উদয়পুর সিটি স্টেশন। কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন। শেষমেষ কোনও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হলনা, দুজনেই পাশাপাশি ঘর পেয়ে যাই হোটেলের তিন তলায়। নীচে ডাইনিং প্লেস। আর একতলায় ব্রেকফাস্ট হল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর হাসিমুখের স্টাফ দেখে স্বস্তি অনুভব করি।

কিছুটা ফ্রেশ হয়ে বসলাম ডাইনিং প্লেসে। খাবারের অর্ডার দিয়ে আমাদের ঘোরার প্ল্যানটা ঝালিয়ে নেওয়া হল। আগেই হোটেলের সঙ্গে কথা বলে দুদিনের জন্য লোকাল গাড়ি বুক করে রেখেছিলাম। সেটা অবশ্য সুদীপের খুব একটা পছন্দের ছিল না। কিন্তু যেহেতু আগে বাসেই যাচ্ছিলাম, তাই গাড়ি বুক করে যাওয়া ছাড়া লোকাল ট্রিপের জন্য আর কোনও রাস্তা ছিল না। যাই হোক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে গাড়ি এল। বেলা প্রায় চারটে বাজে - যেতে হবে ১০৯ কিলোমিটার পথ - পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে। এদিকটা ভারতের পশ্চিম বলে, সূর্যদেবের প্রকাশকাল অন্যান্য স্থানের তুলনায় একটু বেশি - আর সেটাই ভরসা। আজকের দ্রষ্টব্য কুম্ভলগড় – যা কিনা আরাবল্লী পাহাড়ের মাথায় বসানো।

কুম্ভলগড় দুর্গ রাজসমন্ড জেলায়, উদয়পুর শহরের থেকে ১০৯ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে, পশ্চিম আরাবল্লী পাহাড়শ্রেণীর চূড়োয়। পাহাড়ের চূড়ার উচ্চতা ৩৬০০ ফিট (১১০০মিটার) এম.এস.এল. (মানে মিন সি লেভেল)। দুর্গের দেওয়ালের পরিসীমা প্রায় ৩৬ কিলোমিটার, যা কিনা বিশ্বের দ্বিতীয় লম্বা দেওয়াল - চীনের প্রাচীরের পরেই। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দুর্গে রাণারা বসবাস করতেন - মহারাণা ভগত সিংহ ১৯৫৫ সালে শেষ রাণা ছিলেন। কুম্ভলগড় দুর্গই মহারাণা প্রতাপের জন্মস্থল।
যদিও ১৫০০ শতাব্দীতে মহারাণা কুম্ভ আদি দুর্গের বিশেষভাবে রূপান্তর করেন এবং তাঁর নামেই দুর্গের পরিচিতি, কিন্তু এই দুর্গের ইতিহাস তার থেকে পুরোনো। আমাদের গাড়ির চালক বাবলু অবশ্য এইসব ইতিহাসের কোনও ধার ধারে না। কথায় কথায় ওকে বর্তমানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী

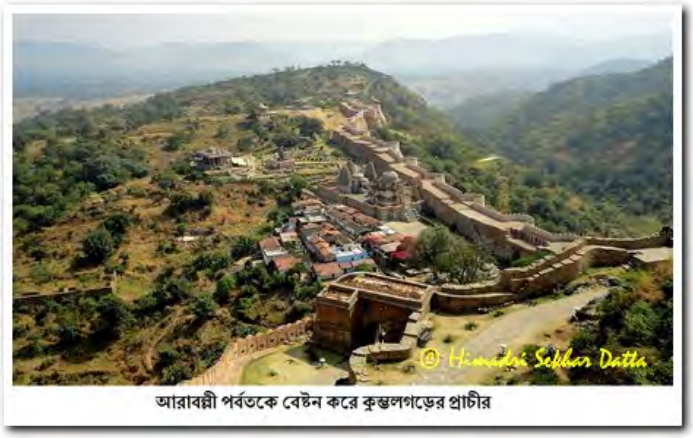

আরাবল্লী পর্বতকে বেষ্টন করে কুম্ভলগড়ের প্রাচীর

কে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিয়েছিল, 'ক্যা পাতা!' কিন্তু সুখের বিষয় কুম্ভলগড়ে বেলাশেষে গাইড না পেলেও, আমরা একটি ছোট মেয়েকে পেয়েছিলাম, যে নিজে থেকে এগিয়ে এসেছিল, গাইড পরিচয় নিয়ে। তবে ওর ঘোরাবার সীমা নির্দিষ্ট ছিল একটি খেজুর গাছ পর্যন্ত। নীচে থেকে ঘুরে ঘুরে রাস্তা দুর্গের মাথায় উঠেছে - সেই পথে দুটো কি তিনটে টার্ন নেবার পরেই সেই খেজুর গাছ, যা ও পার করতে রাজী নয়। জানিনা সেটা তার নিজস্ব পছন্দ না অন্য কোন অজানা কারণ! কথায় কথায় জানা গেল, ক্লাস সেভেনে পড়ে, বাবা গাড়ি চালায়, দাদাজী গাইড ছিলেন - তার কাছ থেকেই কুম্ভলগড়ের কিছু কিছু শুনেছে। তারপর নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে রাজস্থানী মিশ্রিত হিন্দিতে শোনাতে লাগল মহা উৎসাহে। প্রফেশনাল গাইডরা যেখানে ৪৫০ টাকা করে নিচ্ছে, ও সেখানে ১০০ টাকা চায়। কিন্তু সেটা ওকে সঙ্গে নেওয়ার মূল কারণ নয়। ওর মুখের মধ্যে, চোখের মধ্যে এমন একটা ভালবাসা চোখে পড়েছিল, যে ওকে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে নিই, বাকীরাও কেউ কোনও আপত্তি করেনি। দুর্গে ঢোকার মুখে আমাদের গাড়ি নিচেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল - দুর্গের ভেতরে গাড়ির প্রবেশ নিষেধ। চিতোরে অবশ্য পুরোটাই গাড়িতে করে দেখা যায়, গাড়ি থামিয়ে নেমে নেমে। সুদীপ দুর্গের গেটে টিকিটঘর থেকে দুর্গ দেখার টিকিট আর রাতের লাইট এন্ড সাউণ্ড দেখার টিকিট কেটে নিয়ে এল। দুর্গ দেখার জন্য প্রতিজন ১৫ টাকা, আর আলো এবং শব্দের অনুষ্ঠানের জন্য জন প্রতি ১০০ টাকা করে টিকিট। শো সন্ধ্যে সাতটায় শুরু হয়, সূর্য ডোবার পরে - পঁয়তাল্লিশ মিনিটের শো। যদি এখানে এসে ইতিহাসকে জানতে হয়, তাহলে শুধু গাইডের ভরসায় না থেকে, এই শো-টি দেখে নেওয়া অবশ্যই উচিত। যদিও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লাইট এণ্ড সাউণ্ডের মত (যেমন হায়দ্রাবাদের গোলকুন্ডা ফোর্ট, আমেদাবাদের সাবরমতী আশ্রম বা গান্ধীনগরের অক্ষরধাম) টেকনিকালি উন্নত নয়। চিতোর দুর্গের পরেই কুম্ভলগড় রাজস্থানের প্রধানতম দুর্গ। আয়তনে চিতোরের থেকেও বড়। রাজস্থানে মাত্র তিনটি দুর্গ ছিল, যেখানে মহারাণাদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষও বসবাস করত - জয়সলমীর, চিতোর আর কুম্ভলগড় দুর্গ। চিতোর, কুম্ভলগড় আর উদয়পুর এই তিনটিকে একসঙ্গে মেবারের প্রধান দুর্গ বলা হয়। এ ছাড়াও মেবার রাজত্বের অধীনে আরও অনেক দুর্গ আছে। মেবার কখনও কারো অধীনতা স্বীকার করেনি, নিজেদের দুর্গ হারিয়েছে, আবার যুদ্ধ করে জিতেছে, জঙ্গলে দিনাতিপাত করেছে, কিন্তু কখনও মোগল বা অন্য আক্রমণের কাছে মাথা নত করে নি। জয়পুর, বিকানীর বা আজমেরের সঙ্গে এখানেই মেবারের পার্থক্য। বাকিরা মোগলের সময় মোগলদের, ব্রিটিশের সময় ব্রিটিশদের তোষামোদি করে নিজেদের রক্ষা করেছে। তারা যে যুদ্ধ করেছে, তা কারোর অধীনে বা আজ্ঞাবহ হয়ে - নিজের রাজ্যের স্বাধীনতার জন্যে নয়; যেমনটি মহারাণা কুম্ভ বা মহারাণা প্রতাপ করে গেছেন আজীবন। তাই একই রাজ্যের পরিধির মধ্যে থাকলেও আজও মেবারের রাজপুত জয়পুরের রাজপুতের জল পর্যন্ত ছোঁয় না।

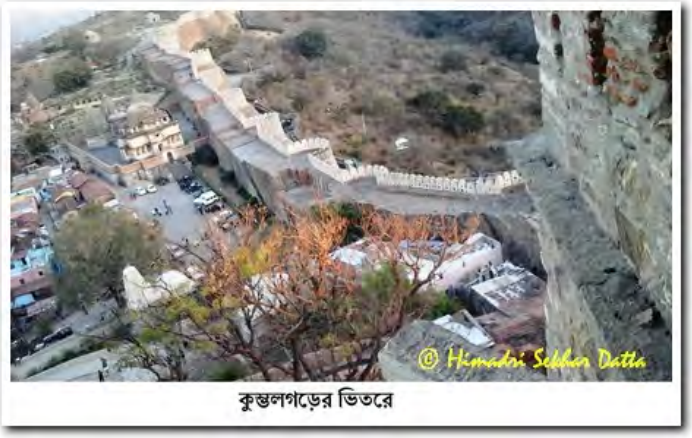

কুম্ভলগড়ের ভিতরে

আমাদের লিটল গাইডের মুখে শোনা আর শো দেখে জানা সব খুঁটিনাটি যদি এক জায়গায় করি তাহলে তা খানিকটা এমন হবে। কুম্ভলগড় দুর্গের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে খুব ডিটেইলে জানা যায় না - কারণ ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব। যদিও এই দুর্গের পত্তন রাজা সম্প্রাতি (মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোকের ছেলে)-এর দ্বারা – তখন এর নাম ছিল মচ্ছিন্দ্রপুর দুর্গ। পাহাড়ের নীচে মচ্ছিন্দ্রপুর বলে সেই সময়ে (৬০০শতাব্দী) একটি গ্রাম ছিল, সেই গ্রামের নামেই অশোকপুত্র এই দুর্গের নামকরণ করেন। ওই সময়ের ইতিহাসবিশেষজ্ঞ সাহিব হাকিম যদিও এই দুর্গের নাম বলেন, মাহোর। অশোকপুত্রের এই দুর্গের পত্তনের মূল কারণ ছিল স্ট্র্যাটেজিক, যা তার নিজের রাজ্যের সুরক্ষার জন্য পশ্চিমের একটা আউট পোস্ট হিসেবে কাজ করত। কিন্তু তিনি নিজে কখনও থেকেছেন কিনা, তা জানা যায় না। তারপর থেকে প্রায় ৭০০ বছর এই মচ্ছিন্দ্রপুর দুর্গের ইতিহাস কালের গভীরে নিমজ্জিত। বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী যখন মেবার আক্রমণ করেন, তখন সেখানে গেহলোট রাজাদের রাজত্ব চলছিল। খিলজী যুদ্ধে গেহলোটদের পরাজিত করে মেবারের অধিকার অর্জন করেন। এই গেহলোট যোদ্ধাদের গোষ্ঠীতেই ছিলেন হাম্বীর। পরে তিনি আবার যুদ্ধ করে এই এলাকা খিলজীর হাত থেকে উদ্ধার করে মচ্ছিন্দ্রপুর দুর্গ থেকেই মেবারের শাসন স্থাপন করেন। তিনিই প্রথম রাণা উপাধি গ্রহণ করেন (রাণা অর্থাৎ যে রণ করে)। গেহলোট গোষ্ঠী থেকে জন্ম হয় শিশোদিয়া গোষ্ঠীর - তার পরের সমস্ত রাজপুত মেবার রাণারা এই শিশোদিয়া বংশের উত্তরপুরুষ। এদের পূজ্য ছিলেন সূর্য, তাই এরা নিজেদের সূর্য বংশীয়ও বলে থাকেন। স্থানীয় চারণগানেও কোথাও কোথাও সূর্যবংশীয় বলে রাণাদের উল্লেখ করা হয়। ইতিহাসে রাণা হাম্বীরের অন্য নাম মহারাণা অজয় সিংহ (১৩০৩ -১৩২৬ খৃষ্টাব্দ, রাজত্বকাল তেইশ বছর)। চিতোরের অন্নপূর্ণা মন্দির, যেটা আমরা সময়াভাবে দেখতে পারিনি, সেটি এই রাণা হাম্বীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ১৩৬৪ সালে হাম্বীর মারা যান। ১৩২৬ থেকে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, মানে প্রায় একশো সাত বছর আরও চার জন রাণা মেবারের শাসন করেন এই মচ্ছিন্দ্রপুর দুর্গ থেকেই। এদের মধ্যে হাম্বীরপুত্র মহারাণা ক্ষেত্র সিংহ, পরে মহারাণা লাখা (লক্ষ সিংহ), মহারাণা চণ্ড ও মহারাণা মোকল (যিনি মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে খুন হন মহারাণা ক্ষেত্র সিংহের ছেলে চাচা ও মেরার হাতে। গুজরাতের সুলতান আহমেদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাণা মোকলকে যুদ্ধ শিবিরেই গোপনে খুন করা হয়)। মেবার রাজত্বের এইসময় যদিও বিশেষ গরিমাপূর্ণ নয়, কিন্তু মহারাণা লাখা সিংহের সময় জাওয়ারে বিখ্যাত তামা-দস্তা-রুপোর খনি আবিষ্কৃত হয়। জাওয়ারের সেই মাইনস আজও চলছে ভারত সরকারের অধীনে। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে মোকলের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুম্ভ মেবারের রাণা হোন। তিনি ছিলেন প্রতাপী, কলাপ্রেমী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং কুশল যোদ্ধা। আমাদের সামনে আজ যে কুম্ভলগড় দুর্গ আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যার বিশালতা দেখে আমাদের মাথা ঘুরে যাচ্ছে, দুর্গের বর্তমান এই রূপ রানা কুম্ভের আমলে। ১৫শ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তুকার মদনকে তিনি মচ্ছিন্দ্রপুর দুর্গ দিয়ে বলেন - এমন দুর্গ বানিয়ে দাও যা কখনও কেউ ভেদ করতে না পারে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে কুম্ভলগড়। সেই সময় রাণা কুম্ভের রাজ্য সীমা মেবারের রণথম্ভোর থেকে বাইরে গোয়ালিয়র (পূর্ব মধ্যপ্রদেশ) পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। তার রাজত্বকালকে এককথায় দুর্গের স্থাপনকাল বলা যায় - তিনি সর্বমোট চুরাশিটি দুর্গের স্থাপনা করেন - যার মধ্যে বত্রিশটির নকশা বা প্ল্যান তিনি নিজেই বানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কুম্ভলগড়। এছাড়া মেবার রাজত্বের মধ্যে, সিরোহীতে বাসন্তী দুর্গ, বদনৌরে বৈরাট দুর্গ, আবুতে অচলগড়, চিতোরগড়ের সাতটি প্রবেশদ্বার সবই তাঁর আমলেই তৈরি। এ ছাড়া অজস্র জলাশয়, মন্দির ও মহল

তিনি বানিয়েছিলেন। রাণা কুম্ভ সঙ্গীতের ওপর কিছু গ্রন্থ লিখেছিলেন - যেগুলি আদি সুর ও তার তান-লয় ও বিস্তারের ভঙ্গিমা ব্যক্ত করে। 'কুম্ভো কা সঙ্গীতরাজ', 'সঙ্গীত মীমাংসা', 'সূড প্রবন্ধ' এই সঙ্গীত গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু নিয়তির কি বিধান জানি না, এমন মহাশক্তিশালী জ্ঞানী কুশল যোদ্ধা মহারাণা কুম্ভ শেষ বয়সে উন্মাদ হয়ে যান - একদিন পূজাগৃহে সকালে পূজা করার সময় কুম্ভের ছেলে রাণা উদা পূজাগৃহে ঢুকে আসে। যেন পিতার আশীর্বাদ নিতে! রাণা কুম্ভ জিজ্ঞাসা করেন - তোমার তো এখন ঘোড়ায় চড়ার সময়, এখানে কি করছ? তার জবাবে উদা নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরিকা বের করে, পিতাকে খুন করে। ১৪৬৮ খ্রিষ্টাব্দের এক সকালে এই মহান চরিত্রের জীবনাবসান হয় নিজেরই ছেলের হাতে।

কুম্ভলগড়ের প্রাচীর

কুম্ভলগড় দুর্গের দীর্ঘ প্রাচীর মেবার রাজ্যকে মারোয়াড় থেকে আলাদা করে রেখেছে। মারোয়াড় বলতে বোঝায় যোধপুরক্ষেত্র (যার মধ্যে পড়ে যোধপুর, নাগাউর, বারমের, পালি ইত্যাদি) যা কিনা দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের অংশ। কুম্ভলগড় সবসময়ই মেবারের রাণা বা তাদের বংশজদের বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছে। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ধাত্রী পান্না চিতোর থেকে নিজের ছেলের প্রাণের বলিদান দিয়ে মেবারের শিশু রাণা উদয় (মহারাণা উদয় সিংহ -২য়) কে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, যিনি পরে উদয়পুরের প্রতিষ্ঠা করেন। উদয় সিংহের ছেলে রাণা প্রতাপও এই দুর্গেই জন্ম গ্রহণ করেন। কুম্ভলগড় অজেয় দুর্গ হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে। আহমেদ শাহ (১৪৫৭, ১৪৫৮, ১৪৫৯); মূহম্মদ খিলজী (১৪৬৭) এরা কেউই কুম্ভলগড় অধিকার করতে পারেন নি। ১৮১৮ সালে এই দুর্গ মারাঠাদের অধীনে আসে তাও টডের মধ্যস্থতায়। যুদ্ধে নয়। ২০১৩ সালে কুম্ভলগড় দুর্গ ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। এই দুর্গ নিয়ে স্থানীয় নানা গল্পকথাও রয়েছে।

সূর্য ডুবে গেছে। আমরাও আস্তে আস্তে পাকদন্ডী বেয়ে নীচের দিকে চলা শুরু করি। যেখানে লাইট অ্যাণ্ড সাউন্ডের প্রোগ্রাম দেখানো হবে, সেটি একটি শিবমন্দির প্রাঙ্গণ। ওপর থেকে সেদিকে তাকাতেই জনারণ্য চোখে পড়ে। সুদীপ আর আমি নীচে নেমে এসে দেখি একটা চায়ের দোকান - মেয়েরা চলে গেল আদিবাসীদের তৈরি হ্যান্ডলুমের দোকানে, জাস্ট দেখে আসি বলে। আমরা চায়ের অর্ডার দিয়ে একটুখানি জিরোনোর জন্য বসলাম। নেমে আসার সময় আমার সঙ্গে চার বিদেশির কিছুটা কথাবার্তা হল - অষ্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন রাজস্থান দেখার জন্য। প্রায় তিন মাস হল আমার মেয়ে জামাই গেছে অষ্ট্রেলিয়াতে - তাই স্বাভাবিক ভাবেই এঁদের সঙ্গে একটু লম্বা কথাবার্তা হয়ে গেল। এঁরা সকলেই সিডনিবাসী। চারজনেই রিটায়ার্ড - ওঁরা জানেন কিনা জানি না, কয়েক লক্ষ বছর আগে ইণ্ডিয়া আর অষ্ট্রেলিয়া একসঙ্গেই জুড়ে ছিল - এখন ভৌগোলিকভাবে দুই গোলার্ধে। চায়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের রাস্তার ধারে এমনভাবে চা-পান ঠিক স্বাস্থ্যকর লাগে নি। বিদেশিরা চলে গেলেন। আমরা চারজনে চা খেয়ে আলো ও শব্দের ওপেন সিনেমাঘরে প্রবেশ করলাম। প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে, তবু জায়গা পেতে খুব একটা অসুবিধে হল না। মন্দির প্রাঙ্গণের পাথরের ধাপে ধাপে লোকেরা বসেছে, যেন ওপেন থিয়েটার। আমাদের সামনে কুম্ভলগড়ের ঐতিহাসিক সেই প্রাচীর, যার ভেতরের দিকে গড়ের মধ্যের কোন একটা অংশে আমরা জটলা করেছি। পেছনে ডানদিক দিয়ে গড়ের রাস্তা একদম পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত উঠে গেছে - যেখান থেকে এই একটু আগেই নেমে এলাম। এখানে সূর্যের আলো যেমন অনেকক্ষণ থাকে, তেমনই সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে পরেই ঘন অন্ধকার হয়ে গেল। এই জায়গাটিতে সাধারণ ভাবে লাইট খুবই কম, মোবাইলের আলো জ্বেলে লোকজন যাতায়াত করছে। একটু পরেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। জোরদার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শেষ হওয়ার পরে ব্যারিটোন আওয়াজে চতুর্দিক গমগমিয়ে উঠল 'ম্যায় কুম্ভল গড় হুঁ'। ইতিহাস আগেই লিখেছি, তাই এখন আর সেই কথায় যাচ্ছি না। অনুষ্ঠান চলা কালীন একবার সোজা আকাশের দিকে চোখ তুলেছিলাম - জানতাম রাজস্থানে আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে - কিন্তু ঠিক ওপরেই সপ্তর্ষিমন্ডল আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে খুব চমকে উঠলাম। পুরাণের সাত ঋষি আকাশের মহাছত্র পটে নিজের আসন বিছিয়ে যেন আমাদের সঙ্গেই কুম্ভলগড়ের ইতিহাস শুনছেন এমনটাই মনে হল। এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে মন ভরে গেল।

অনুষ্ঠানশেষে অন্ধকারে ঢালু পথ বেয়ে ফিরে চললাম উদয়পুরে আমাদের এখানকার ঠিকানার দিকে। আর হয়তো কখনও আসা হয়ে উঠবে না, কিন্তু যা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি তা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এক ভালোবাসা ও ভালোলাগার মানিক রতন হয়ে হৃদয়ে বিরাজ করবে। হোটেলে ফিরে পরের দিনের জন্য যে গাড়ি বুক করা আছে তা আবার গাড়িওলাকে মনে করিয়ে দিলাম, আর সেই সঙ্গে একটু তাড়াতাড়ি পাঠাবারও অনুরোধ করলাম। রাত্রি সাড়ে এগারটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাইরে লবিতে এসে বসি। সারাদিনের গল্প আর আগামীকালের প্ল্যান সবই একবার আলোচনা হল। কালকে সন্ধেয় ফিরে উদয়পুরে লেকের ধারে যাওয়া হবে এটাও ধার্য হল। সুদীপ ও তার গিন্নি আবার বাইরে গেল একটু হেঁটে আসার জন্য - আমরা দুজনে রুমের দিকে পা বাড়াই।

চিতোরগড় যাওয়ার পথে

সাড়ে আটটায় গাড়ি আসবে। আজকের গন্তব্য চিতোর। সকালে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট হলে গিয়ে যে যার পছন্দমত খাবার খেয়ে নিলাম। আজকে আমাদের গাড়ি সুইফট ডিজায়ার - আর গাড়ির চালকও বেশ ভদ্রগোছের। হাসি মুখে গুডমর্নিং জানিয়েই আমাদের মনটা জিতে নিল। পৌনে নটা নাগাদ চিতোরের পথে বেরিয়ে পড়লাম। চিতোর যাওয়ার প্রায় সমস্ত রাস্তাটাই হাইওয়ে। উদয়পুর থেকে ১২৪ কিলোমিটার দূরে। রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে, আরাবল্লী পাহাড়ের মাথায় (উচ্চতা ৩৯৪ মিটার/ ১৩০০ফিট) গম্ভীরি নদীর তটে স্থাপিত চিতোর নগরী। চিতোর জেলার ভূমিগত আয়তন সমগ্র রাজস্থানের প্রায় চার শতাংশ। চিতোরের আদি নাম ছিল চিত্রকূট - চিত্রাঙ্গদ মোরী বলে এক রাজপুত সেনানায়কের নামে - যা প্রাচীন মেবারী মুদ্রার ওপর বর্ণিত আছে। কথিত যে চিতোরের আদি দুর্গ এই চিত্রাঙ্গদ মোরীরই হাতে তৈরি

হয়েছিল। মোরী বংশের এই দুর্গ পরে রাওয়াল বাপ্পা (অরিজিনালি গেহলোট বংশজ - কিন্তু রাওয়াল গোষ্ঠীর), যিনি মেবার রাজ্যের স্থাপনা করেন, মোরীদের কাছ থেকে জিতে নেন আর এখানেই ৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মেবারের প্রথম রাজধানী নির্মাণ করেন। আবার জনমুখে এই প্রবাদও চালু আছে যে বাপ্পা রাওয়াল নাকি বিবাহের যৌতুক হিসেবে এই দুর্গ পান শোলাঙ্কিদের কাছ থেকে - কারণ শোলাঙ্কি রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তারপর থেকে বাপ্পার বংশজরা মেবার শাসন করেছে ১৬০০ শতাব্দী পর্যন্ত। সামান্য সময়ের জন্য অধিকার হারালেও বাপ্পা রাওয়ালের বংশজরা মেবারের রাজধানী হিসেবে চিতোরে আটশো চৌত্রিশ বছর টানা রাজত্ব করেছেন।

যদিও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, কিন্তু কথিত যে চিতোর স্থানটি মহাভারতের সময়ও বিরাজ করত। মধ্যমপান্ডব মহাবলশালী ভীম এই স্থানে এক সাধু-মহাত্মার কাছে এসেছিলেন অমরত্ব লাভের মন্ত্র শিখতে। সেই সাধুর সঙ্গে তার দিনাতিপাত ও শিক্ষা ভালোই চলছিল, কিন্তু যতগুলি নিয়মের পালন করার ছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি আর ধৈর্য্য রাখতে পারেননি - রাগে ও হতাশায় খুব জোরে মাটিতে লাথি মারেন - যার থেকে ভীমতাল/ মতান্তরে ভীমলাত বলে একটি জলাশয়ের উৎপত্তি হয়। ভীম নিরাশ হয়ে ফিরে যান, কিন্তু এই পাহাড়ি রুক্ষ এলাকায় ওই জলাশয়ের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে মানুষের বসবাস শুরু হয়ে যায়। গম্ভিরী নদীতটে আদি প্রস্তরযুগের (early stone age) কিছু কিছু অবশেষ পাওয়া গেছে। বৌদ্ধকালে (আজ থেকে ২৬০০ বছর পূর্বে) এই জায়গাটি ভারতের ষোলোটি মহাজনপদের মধ্যে অবন্তি মহাজনপদে সম্মিলিত ছিল বলে মনে করা হয়। একসময় চিতোর সম্রাট অশোকের অধীনেও ছিল যখন তিনি উজ্জৈনের শাসক ছিলেন। তখন চিতোর উজ্জৈন (উজ্জয়িনী) থেকে শাসিত হত। পরে এই পুরো এলাকা শকদের হাতে চলে যায়। তারা পশ্চিম থেকে এসে ভারত আক্রমণ করেছিল। তখন এই জনপদের নাম বদলে হয় শিবি জনপদ। শকেরা তিনশ বছর শাসন করে। তারপরে গেহলট / গুহিলেরা মেবার ক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে, আর শেষ পর্যন্ত শকেদের হটিয়ে রাওয়াল বাপ্পাদিত্য (গহিল/ গুহিল/ গেহলট বংশীয়) মেবারে তার রাজত্ব স্থাপনা করেন, চিতোরকে রাজধানী বানিয়ে। এই বংশই পরে শিশোদিয়া গোষ্ঠীতে ভেঙে যায়, যার শেষ মহারাণা ছিলেন মহারাণা ভগবত সিংহ (১৯৫৫ -১৯৮৪)। এই বংশেই রাণা কুম্ভ, রাণা প্রতাপ, রাণা উদয়সিংহ এমন সব মহান যোদ্ধারা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে তো আগেই বলেছি।

ইতিমধ্যে আমাদের সুইফট ডিজায়ার তার গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছেছে। সুদীপ, আমাদের টীম ম্যানেজার, দুর্গে ঢোকার টিকিট কেটে নিয়ে এল। গাড়ির জন্যও আলাদা টিকিট কাটতে হল। চিতোরগড় ২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে পাহাড়ের মাথায় সেই কোন অনাদিকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাস বলে চিতোর দুর্গের ওপরে তিনবার ভয়ানক আক্রমণ হয়েছিল - তার ফলস্বরূপ তিন তিনবার এখানে জহরব্রতের উদযাপন হয়। হাজার হাজার রাজপুত নারী তাঁদের জীবন বিসর্জন দেন জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে। সেই কথা বলার আগে, আমাদের চিতোর প্রবেশ নিয়ে কিছু বলি। রাণা কুম্ভের হাতে এই দুর্গের সংস্কার ঘটে এবং শত্রু-আক্রমণের থেকে নিজেদের রক্ষার্থে তিনি এই দুর্গের ভিতর সাতটি দরজা নির্মাণ করেন। সমতল থেকে ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে উঠতে উঠতে আমরা পেরিয়ে আসি সেই সাতটি দরজা - পাডন পোল, ভৈঁরো পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, জোড়লা পোল, লক্ষ্মণ পোল আর রাম পোল। দুর্গের ভেতরে কোনও মহলই তার সম্পূর্ণ আকারে আর নেই - কেবল ভগ্নাবশেষ মাত্র - কিন্তু সেগুলির গঠন, আয়তন আর বিস্তার দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে মহলগুলি কত বড় ছিল! মহলের ভগ্নাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার সময় বার বার মনে হচ্ছিল, এই সেই দুর্গ যার পথ আর সিঁড়ি ধরে রাণা কুম্ভ বা রাণা প্রতাপ হেঁটে গেছেন এক দিন। সমস্ত মহলের ছাদ ভেঙে ফেলা হয়েছে - এই সব কাজ আলাউদ্দিন খিলজী, আহমেদ শাহ আর কিছুটা আকবরের করা। তিনবার আক্রমণের ফলে তিন লক্ষাধিক মানুষের রক্ত এই দুর্গের মাটিতে মিশেছে। এ এক অসামান্য আত্মত্যাগের ইতিহাস।

চিতোরগড়ের তোষাখানা

সারাক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পরে আমার মনে হল চিতোর প্রধানত তিনজনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে - একজন অবশ্যই রানি পদ্মিনী, অন্য জন মীরাবাঈ আর শেষজন হলেন ধাত্রী পান্না। মহারাণা সমর সিংহের (তৃতীয় রাণা) পরে তার ছেলে মহারাণা রতন সিং (১৩০২) মেওয়াড়ের সিংহাসনে বসেন। রতন সিংহ মাত্র এক বছর রাজত্ব করেছিলেন (১৩০২ -১৩০৩)। রাণা হয়ে বসার মাস খানেকের মধ্যে চিতোরের ওপর প্রথম আক্রমণ আসে – দিল্লিতে তখন সুলতান বংশ - সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী ১৩০২ খ্রিষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করেন। আক্রমণের হেতু অনেকেই বলেন রানি পদ্মিনীর রূপখ্যাতি। দিল্লীর সৈন্যদল ছয় মাস চিতোর দুর্গ ঘিরে থাকে। দুর্গের ভেতর খাদ্য ও পানীয় জলের চূড়ান্ত ঘাটতি দেখা যায়। দুর্গকে আর বাঁচানো যাবে না দেখে, রাজপুত নারীরা প্রাণ বিসর্জন দেন তাদের রীতি অনুযায়ী জহর ব্রত করে। শেষ যুদ্ধে রতন সিংহও নিহত হন। কথিত আছে রানি পদ্মিনীর সঙ্গে ১৬০০০ রাজপুত নারী মুখে তুলসী পত্র নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন। যুদ্ধশেষের পর খিলজী একজন নারীকেও কেল্লার ভেতর না পেয়ে ক্রোধে সমস্ত মন্দির, প্রাসাদ ধুলিসাৎ করে দেন। গাইড আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই এক টুকরো চৌকোনা জমি বার বার দেখাতে থাকেন, যার নীচে এক বিশাল গহবর আছে, যাতে নাকি ষাট লক্ষ মণ কাঠ আর ঘি জ্বালানো হয়েছিল, আর প্রাসাদের সমস্ত রাজপুত নারী তাদের মহারানি পদ্মিনীর সঙ্গে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত পূর্ণ করেছিলেন।

পরের আক্রমণ হয় ১৫৩৪ সনে যখন রাণা প্রতাপের বাবা উদয় সিংহ (২য়) মেবারের রাণা ছিলেন। এই আক্রমণ করেছিলেন গুজরাতের বাহাদুর শাহ। উদয় সিংহ পরে রাজধানী উদয়পুরে সরিয়ে নিয়ে যান। সেবারেও জহরব্রতে অনেক রাজপুত মহিলা প্রাণ দেন। চিতোরের ওপর শেষ আক্রমণ করেন সম্রাট আকবর ১৫৬৭-তে। দুর্গের নীচ থেকে আকবরের কামানের গোলা যখন চিতোরের দেওয়ালে পৌঁছাচ্ছিল না, তখন তিনি দুর্গের লেভেলে কামান লাগানোর জন্যে দুর্গের সামনে মাটির ঢিপি বানাতে আদেশ দেন - সেই ঢিপি আজও বিদ্যমান - যার পোষাকী নাম মোহর মার্গি (মোহর পর্বত)। কারণ কথা হয়েছিল, সারাদিন মাটি ঢালার পরে শ্রমিকদের একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। কিন্তু সেই মাটির পর্বত তৈরি হওয়ার পরেও আকবরের কামান চিতোরের দুর্গের কিছুই করতে পারে নি – কারণ গোলা যখন গিয়ে দেওয়ালের কাছে গিয়ে পড়ত, তার গতিবেগ কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। যাই হোক চার মাস ধরে দুর্গের চারপাশে প্রায় ষাট হাজার মোগল সৈন্যের ঘেরাওয়ের পর ১৫৬৮-র ফেব্রুয়ারি মাসে চিতোরের পতন ঘটে। মোগলসৈন্য যখন দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করে খালি দুর্গের ইট-কাঠ ছাড়া তাদের হাতে আর কিছুই আসে নি। শেষজীবনে আকবর রাজপুতদের এই অসীম সাহস আর নির্লোভ বলিদানে এতই আবিষ্ট হন যে রাজপুত বীরদের স্মরণে তিনি শ্বেতপাথরের মূর্তি বানিয়ে আগ্রায় স্থাপন করেন।

মীরাবাঈ ছিলেন রাজস্থানের পালীপ্রদেশের কন্যা। তাঁর বিবাহ হয়েছিল সংগ্রাম সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে, যিনি অল্পদিনেই মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পরে মীরা তাঁর জীবন সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সমর্পণ করেন। রাজ ঘরানার বধূ, সাধু-সন্তদের সঙ্গে খোলা রাস্তায় কীর্তন করছেন - এটা রাজপরিবার মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা মীরাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। উত্যক্ত হয়ে মীরা একদিন মেবার ছেড়ে মথুরা, বৃন্দাবন পাড়ি দেন - ঘুরতে ঘুরতে দ্বারকা পৌঁছান। ভক্তিযোগের প্রথম রাস্তা ১৬০০ শতাব্দীতে মীরাবাঈ-এর হাত ধরেই আসে। রাজস্থানে সে সময় সতীপ্রথা ছিল, তবুও মীরা কেন সতী হননি সে প্রশ্ন কেউ কখনও তোলে নি। চিতোরে মীরাবাঈ-এর মন্দিরে আমরা গেছিলাম, কিন্তু সচরাচর ক্যালেন্ডারে মীরাবাঈ-এর যেমন ছবি দেখি তেমনই একটা ছবি বা পেইন্টিং মন্দিরের সিংহাসনের নিচে বসানো আছে। সিংহাসনে আসীন বাঁশী হাতে মীরার আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। খঞ্জনী বাজিয়ে এক বৃদ্ধা - আজকের মীরাবাঈ, আসল মীরাবাঈ-এর লেখা কোনও গান হয়তো গাইছিলেন - অনেক চেষ্টা করেও তার একটা শব্দও বোধস্থ করতে পারি নি। বোধহয় আমার মত পাপী লোকের কানে কৃষ্ণনাম প্রবেশ

পায়নি।

মীরাবাঈয়ের মন্দির

আমাদের স্কুলের ইংরেজির পাঠ্যবই-এ একটা লেখা ছিল - খুব সম্ভবত ক্লাস সিক্সে, 'ইন্ডিয়া রিডার'-এ - ধাত্রী পান্নার গল্প। মেবার রাণাদের বংশরক্ষার কৃতিত্ব পুরোপুরি পান্নাবাইকে দেওয়া যায়। শিশু উদয় সিং-এর লালন পালনের ভার তার ওপরেই ছিল। পান্নার নিজের ছেলে চন্দন আর উদয় ছিল সমবয়সী। সংগ্রাম সিংহের ভাই পৃথ্বীরাজের দাসীপুত্র ছিল বনবীর। সে নিজেকে মেবারের ভবিষ্যত রাজা হিসেবে ভাবত। সে ঘুমন্ত অবস্থায় মহারাণা বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করে। তারপরে মেবার বংশের শেষ কুলদীপ উদয় সিংকেও হত্যা করতে যায়। তখন পান্নাবাই উদয়কে তার পালঙ্ক থেকে সরিয়ে নিজের ছেলেকে সেই পালঙ্কে রেখে দেয়। তার চোখের সামনেই নিজের ছেলেকে খুন হতে দেখেও পান্নাধাই এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি। এত বড় আত্মত্যাগ, ইতিহাসে, প্রভুপুত্রের জন্যে কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। ধন্য তুমি ধাত্রীপান্না।

চিতোরে আরও দুটি অভাবনীয় জিনিস আছে যা অবশ্যই দেখার। তার একটি বিজয়স্তম্ভ আর অন্যটি কীর্তি স্তম্ভ। বিজয়স্তম্ভের নির্মাতা রাণা কুম্ভ। ১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মালয়াড়ের সুলতান মহমুদ শা-কে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, সেই বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ হল বিজয়স্তম্ভ। ১২২ ফুট উঁচু এই স্তম্ভে গায়ের নিঁখুত ভাবে খোদাই করা রয়েছে হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি । প্রত্যেক দেবদেবীর নীচে তাঁর নামও লেখা আছে। স্তম্ভের ভেতরে ১৫৭টি সিঁড়ি আছে ওপরে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সেই পথ এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কীর্তিস্তম্ভও চতুর্দশ শতাব্দীতেই বানানো – তবে এটা রাণারা বানান নি। এটির নির্মাতা দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনরা। লম্বায় ৭৫ ফুট। ভেতরে ৫৪টি সিঁড়ি আছে - কিন্তু এখানেও ভেতরে যাওয়া বন্ধ। এই স্তম্ভের চারদিকে ভগবান আদিনাথের জোড়ামূর্তি আছে।

ঘোরার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই বাদাম, পেয়ারা, লেবুর জল বা কমলার রস খাওয়া চলছিল। চিতোর দেখা শেষ হল সূরয পোলে এসে। এই দরজাটির পর কেল্লার পাহাড় সটান সমতল ভূমিতে নেমে গেছে - ধাপে ধাপে নয়, একদম হঠাৎ। পুবদিকে হওয়ার জন্য ভোরের প্রথমসূর্যের আলো এই দরজা দিয়ে কেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করত - তাই নাম সূরজ পোল। নিচের ওই সমতল ভূমিতে আকবর তার সেনাদের নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে চিতোর জয়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন। পাহাড়ের মূল অধিবাসী ভিলেরা আজও আছে। তারা এখন মহার্ঘ জড়িবুটি আর আয়ুর্বেদিক বৃক্ষ-গুল্ম-লতার চাষ করে রাণাদের দেওয়া জমিতে সরকারি সহায়তায়। সেইসব অতি দুষ্প্রাপ্য আয়ুর্বেদিক জড়ি-বুটি দিয়ে এখানে হস্ত শিল্পীরা নানানকিছু বানাচ্ছেন - যেমন চাদর বা হালকা লেপ, যা পেতে বা গায়ে দিয়ে শুলে নাকি গায়ের ব্যথা বা নাক ডাকা সেরে যাবে!

ফেরার পথে চিতোর মনের মধ্যে একটা হাহাকার আর বেদনা ছড়িয়ে দিল - যা এখানে এক সময় আপন বৈভব আর শক্তির সামঞ্জস্যে অপরূপভাবে ছড়িয়ে ছিল, আজ তার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রেতভূমিতে শুধুই পদচারণা করে এলাম। চিতোরের পুরোনো রূপ আর কোনদিনও আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু যেটুকু রয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার সৎ চেষ্টাও কি আছে? শহুরে দোকানপাট আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শখের নিবারণ করছে ঠিকই, কিন্তু জাতীয় স্মারকের চারপাশে না ছড়িয়ে এই সব দোকানপাট কোনও একটা নির্ধারিতস্থানে একত্রে রাখতে পারলে বোধহয় ভাল দেখাত। তবে এটা আমার নিজস্ব ভাবনা।

সন্ধ্যা যখন কিছুটা রাতের পথে এগিয়েছে সে সময় আমরা চিতোর থেকে উদয়পুর ফিরে আসি। এবারের মতো ঘোরাফেরা সাঙ্গ হল। যদিও বেড়ানোর শেষ চরণ এখনও বাকি আছে। রুমে ফিরে চা খাওয়া হল। মিনিট পনেরো-বিশের মধ্যেই সুদীপের ডাক, 'চল এবার এখানকার লেকে যাওয়া যাক - একটু বসে চলে আসব।' উদয়পুর শহরের মধ্যে দুটি বড় লেক আছে - একটির নাম পিছোলা লেক (Pichola Lake) আরেকটির নাম ফতেহ সাগর। রাস্তায় বেরিয়ে লেক জিজ্ঞাসা করলে, স্থানীয় লোকজন পিছোলা লেকের রাস্তা দেখিয়ে দেবে। পিছোলা লেকের মধ্যেই লেক প্যালেস স্থাপিত, যা এখন একটি হেরিটেজ হোটেলের রূপ পেয়েছে। বেশির ভাগ ফরেন ট্যুরিস্টই ওখানে থাকেন। রাতের অন্ধকারে লেকের জলের মধ্যে হাজার আলোর রোশনাই নিয়ে জেগে থাকা লেক প্যালেস দেখলাম - নয়নাভিরাম সে দৃশ্য। কিন্তু সুদীপ আসলে খুঁজছিল ফতেহ সাগর লেক - জিজ্ঞাসাবাদের সময় পিছোলা বলায় আমাদের কিছুটা গলিপথ ঘোরাঘুরি করতে হয়। তাতে অবশ্য একটা লাভ হয়েছিল, রাতের উদয়পুর আর তার রাস্তাঘাটে দোকানপাট-মানুষজন কেমনভাবে থাকে তার একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল। স্থানীয়েরা এবং রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ যতটা পারেন সাহায্য করারই চেষ্টা করেছেন। অবশেষে পৌঁছালাম ফতেহ সাগর লেক। লেক পিছোলার উত্তরে হল এই লেক মহারাণা ফতেহ সিংহ উদয়পুরের উদ্যোগে বানানো। সব মিলিয়ে অবশ্য উদয়পুরে চারটি লেক আছে, দুটির কথা বললাম, বাকী দুটি হল উদয় সাগর লেক (উদয়পুর সিটি থেকে ১৩ কিমি পূর্বে) আর ডেহবার লেক বা জয়সমন্ড লেক (উদয়পুর থেকে ৫২ কিমি দক্ষিণ পুর্বে)। ফতেহ সাগর আর লেক পিছোলা আবার নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত। ফতেহসাগর লেকের মাঝে দুটি ছোট্ট দ্বীপ আছে, যাতে রয়েছে নেহরু গার্ডেন ও উদয়পুর অবজারভেটরি। রাতে নৌকা চলাচল বন্ধ ছিল, তাই যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ফতেহ সাগরেও মধ্যেও বর্তমানে একটি লেক হোটেল তৈরি হয়েছে - নানানরকম আলো আর রঙিন ফোয়ারা দিয়ে সুসজ্জিত সেটি। কিছুক্ষণ ওখানে বসে, নিজেদের ছবি তুলে ডিনারের আগে ফিরে আসি ডেরায়।

শোওয়ার আগে ট্যাবের ওপর আঙুল চালিয়ে তিনদিনের ছবিগুলি দেখছিলাম - ঘোরাঘুরি মন্দ হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা আমরা খুব উপভোগ করেছি এই আউটিংটা। মানুষ আসলে মুক্তই থাকতে পছন্দ করে - সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ে নিজেই ক্রমশ শক্ত করে শিকল বেঁধে চলেছে। কিন্তু তাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে মনের গভীরে সে সব সময়ই শিকল ভাঙতেই চেয়েছে। আসুন শেকলভাঙার দল ভারী করি। চরৈবেতি।

চিতোরগড়ের ধ্বংসস্তূপে মাথা উঁচু করে আছে বিজয়স্তম্ভ

~ *রাজস্থানের তথ্য* ~ *রাজস্থানের আরও ছবি* ~

জিওলজি পড়ার সময় আর চাকরির খাতিরে ভারতের বিভিন্ন দেশ, শহর, গ্রাম ঘুরেছেন হিমাদ্রি শেখর দত্ত। মিশেছেন স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে। বাংলা-ইংরেজির পাশাপাশি স্বচ্ছন্দ অসমীয়া ও গুজরাটি ভাষাতেও। নানা বিষয়ে লেখালখি করাটাই সখ। পাঠক পড়লে অবসরের পর লেখালেখি নিয়েই দিনযাপনের ইচ্ছে। প্রকাশিত পুস্তক - 'স্ব' এবং 'এক ছক্কা তিন পুট'। এখন সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন আমাদের ছুটি পত্রিকার সঙ্গেও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেঁচে ওঠা ল্যাংটাং-এ

সৌম্যদীপ হালদার

~ ল্যাংটাং-গোঁসাইকুণ্ড ট্রেকরুট ম্যাপ ~ ল্যাংটাং-এর আরও ছবি ~

ঠিক বুঝতে পারছিনা কোথা থেকে শুরু করব। ২০১৬-র জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। আমরা তিন সদস্য ক্লাবে গেছি। গডফাদারকে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যাওয়া যায়? মৃদু হেসে বলল, 'যেদিকে দু চোখ যায়, আমাকে জিজ্ঞাসা করবিনা।' তারপর নিজেই বলল, 'ল্যাংটাং ঘুরে আয়।' এক কথায় যাকে বলে মেঘ না চাইতে জল। 'ল্যাংটাং' নামটা নতুন লাগল, তাই করুণ মুখে জিজ্ঞাসা করলাম জায়গাটা কোথায়? স্যার বেশ কিছুক্ষণ আপাদমস্তক তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'নেপাল।' একটা রুট ম্যাপও দিলেন।
একটা অচেনা দেশে ট্রেক করার ভাবনাটাই তখন আমাদের তিনজনের কাছে সেরা প্রাপ্তি। কী করে যাব, কিভাবে যাব, কোথায় থাকব সেটা তো পরের ব্যাপার। খানিক পরে গুগল-এ দেখলাম বলছে, ২০১৫-র ২৫ এপ্রিল ভূমিকম্পে নেপাল-এর যে জায়গাটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রায় নেই হয়ে গেছে, তার নামই ল্যাংটাং। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, মানুষজনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অর্থে বদলে গেছে, বলা বাহুল্য শুধু নামটাই এক আছে আর কিছু নেই। একমুহূর্তে তিনজনেরই মন বলল চলো।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত দিন ১০ অক্টোবর, ২০১৬ - ঘড়ি বলছে বিকাল ৩.৪৫, মিথিলা এক্সপ্রেস আমাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করল। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের জিজ্ঞাসাও বাড়ছিল। আর এইসবকিছুকে অতিক্রম করে বেড়ে উঠছিল অজানাকে জানবার নেশা। রক্সৌল পৌঁছে সেখান থেকে বীরগঞ্জের পথে হঠাৎ ফোনের টাওয়ার বিদায় জানাতে বুঝলাম এলেম নতুন দেশে।
জেসসি-র কথা অনুযায়ী আমরা মোছাপোখরিতে রইলাম। মোছাপোখরি (৫৮১ মিটার) একটা ছোট্ট শহর, কাঠমান্ডু থেকে দূরত্ব মাত্র ৩.৫ কিমি। পৌঁছে বেশ অবাক হলাম যে বেশিরভাগ মানুষই জানে না ল্যাংটাং বলে কোনও জায়গা আছে!
জেসসি কে তা অবশ্য বলা হয়নি, পুরো নাম জেসসি স্মিথ (Jessey Smith)। যে না থাকলে হয়তো আমাদের ট্রেকটা সম্ভব হতো না। কানাডানিবাসী জেসসি ভূগোলে স্নাতকের পাঠ নিচ্ছে। নেপালের সেই ভয়ানক ভূমিকম্পের পর ওখানে যায়। ফিরে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতা লোনলি প্ল্যানেটে লেখে। সেই লেখা পড়েই ফেসবুকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি। ও-ই আমাদের সব পরিকল্পনা, খরচাপাতি আর ল্যাংটাং-এর বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করায়।
১২ অক্টোবর সকাল ছটায় সিয়াব্রু-র বাসে চেপে বসলাম। রাস্তার অবস্থা না বলাই ভালো। তবে তাপি নদীর পার হওয়ার পর থেকে রাস্তাটা বেশ। বিকালে পৌঁছালাম ধুনছেতে। ধুনছে (১,৭৬৪ মিটার) এখানকার নামকরা একটা শহর যেখান থেকে গোঁসাইকুণ্ড ট্রেক হয়। এখান থেকে সিকিউরিটি চেকের পর অনুমতিপত্র নিয়ে বাস চলল ল্যাংটাং।
অনুমতিপত্র নিয়ে কোথাও সম্পূর্ণ তথ্য পাইনি, নানা জনের নানা মত। ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। গাইডশুদ্ধ ট্রেক করতে গেলে TIMS (Trekkers' Information Management System) কার্ড বানাতে হয়, যার মূল্য প্রায় ৩৫০০ এন সি (নেপালী টাকা)। তবে গাইডের প্রয়োজন না হলে এই কার্ডেরও দরকার হয় না। এছাড়া ল্যাংটাং ন্যাশনাল পার্ক-এর অনুমতিপত্রের জন্য দরকার হয় যেকোনও একটা সচিত্র পরিচিতি পত্র (ভোটার কার্ড/প্যান কার্ড/পাসপোর্ট ইত্যাদি, কিন্তু আধার কার্ড চলবেনা) আর ১৬৯৫ এন সি (সার্ক দেশগুলির জন্য) অথবা ৩৩৯৫ এন সি (অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে)। এছাড়া হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং-এর জন্য ২২০০ এন সি।
বিকাল সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছালাম সিয়াব্রু-বেন্সি-তে। রাস্তায় দুজন নেপালি বন্ধু পেয়েছিলাম। সিয়াব্রু-বেন্সি (১৪৬০ মিটার) থেকে শুরু হয় ল্যাংটাং ভ্যালি ট্রেক। পৌঁছাতেই তরতর করে বয়ে যাওয়া ল্যাংটাং খোলা যেন সাদর সম্ভাষণ জানাল।

১৩ অক্টোবর সকালে পিঠে স্যাক নিয়ে ল্যাংটাং খোলা-র পাশ দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। বহু প্রতীক্ষিত বহু প্রত্যাশিত স্বপ্নযাত্রা। নদী যেন সকালের আলোয় হেসে বলে উঠল, 'তাসি দেলে' (তিব্বতী শব্দ যার অর্থ সুপ্রভাত), আজ কিন্তু চলে যেও ঘোড়ে তাবেলা অব্দি। কাজু, ঝরনার জল আর দিদার দেওয়া সুপারিকুচো সহযোগে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পৌঁছে যাব ৎসেরগো রি (Tsergo Ri) এই ভাবনা নিয়ে একে একে তিওয়ারি, ডোমেইন, ব্যাম্বো অতিক্রম করে রিস্চে (২৩৯৯ মি), লামা (২৪১০ মি) হয়ে রিভার সাইড গ্রাম পৌঁছালাম। ব্যাম্বো থেকে রিস্চের এলিভেশন ডিফারেন্স ৪০০ মিটার এবং পুরোটাই খাড়াই। গোটা রাস্তায় আমাদের সাথী ছিল বানর, কাঠবিড়ালি আর নাম না জানা রকমারি পাখি। রিভার সাইড-এ পৌমচে স্যার দাওয়া (তিব্বতী শব্দ যার মানে সূর্য) বলল, আজ চললাম। ঘড়িতে চোখ পড়তে দেখি বিকেল তখন সাড়ে পাঁচটা। তখনও সেদিনের গন্তব্যস্থল থেকে প্রায় দেড়-দু ঘন্টার দূরত্বে রয়েছি। তবে শেষপর্যন্ত মোটামুটি মিনিট পঞ্চাশের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। এটা ছিল আমাদের জীবনের প্রথম রাত্রিকালীন ট্রেক। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চাঁদনী রাতে এগিয়ে যাচ্ছি তিনজনে। অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা।
দিন্দু লামা ঘোড়ে তাবেলা (Ghoda Tabela)-র তিব্বতী হোটেলের মালিক। এমন চনমনে সতেজ ভালোমানুষ কারোর দেখা মনে হল যেন কখনোই পাইনি। সত্যি কথা বলতে তের ঘন্টা ধরে ১৬ কিমি ট্রেক করে আমরা তখন একেবারে বিধ্বস্ত, কিন্তু দিন্দুজির উৎসাহী ব্যক্তিত্ব আর হাতেগরম সব তথ্য এক মুহূর্তে আমাদের ক্লান্তি দূর করে দিল।
প্রথমে ল্যাংটাং শব্দটার প্রসঙ্গে আসি। আদতে 'লামদাঙ' শব্দের অপভ্রংশ। তিব্বতী শব্দ 'লাম' কথার অর্থ ষাঁড়। প্রচলিত গল্পকথা এই, গুরু

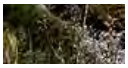

ল্যাংটাং খোলা

পদ্মসম্ভবের পোষ্য ষাঁড়টি তিব্বত থেকে আসার পথে সিফ্রু থেকে ল্যাংটাং হয়ে কায়ানজিং পর্যন্ত গোটা রাস্তাতে সব ঘাস খেয়ে ফেলে। পদ্মসম্ভব খুঁজতে গিয়ে দেখেন যে কায়ানজিং থেকে ১২ কিমি আগে লাংশিশা খারকা নামে স্থানে ষাঁড়টি মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ষাঁড়টির জন্য স্থানটি পবিত্র হয়ে যায়। নাম বদলে হয় লামদাঙ।

১৪ অক্টোবর, ২০১৬, সকালে বিন্দু লামার আতিথেয়তায় তিব্বতী চাপাটি ভোজনের পর যাত্রা শুরু করলাম। একটু এগোতেই চোখে পড়ল তুষারশুভ্র ল্যাংটাং রি (৭২০৫ মি), মনটা একেবারে প্রশান্তিতে ভরে গেল। আগেকার দিনে এখানে ঘোড়ার চল ছিল, আস্তাবলও ছিল। তাই এই জায়গার নাম ঘোড়ে তাবেলা (৩০০০ মিটার)। একে একে ঠ্যাংশেপ, গুম্বা ক্রস করে দূর থেকে চোখে পড়ল ল্যাংটাং।

দেখে ভালো লাগলো ভূমিকম্পের আকস্মিকতার রেশ কাটিয়ে ল্যাংটাং সেজে উঠছে নতুন রূপে - নতুন জায়গায় আধুনিকতার ধাঁচে। আগেকার গ্রামটি আর নেই। তার থেকে আরও মিনিট পাঁচ-সাতেক এগিয়ে গেলে নতুন ল্যাংটাং গ্রাম (৩৫৪১ মিটার)। আরও উত্তর দিকে মুন্ডু (৩৫৪৩ মি) অতিক্রম করে কায়ানজিন গুমফা -র দিকে এগোতে এগোতে গর্জনময়ী খোলা আর ল্যাংটাং লিরুং (৭২৩৪ মি), ল্যাংটাং রি (৭২০৫ মি), গাঙচেঙপ (৬৩৮৭ মি) এবং গাঞ্জালা পাস চোখে পড়ল। তারা যেন দেখছে মনিওয়ালগুলো ঠিক মতো ক্রস করছি কিনা। মনিওয়ালে সবসময় বামদিক থেকে হাঁটতে হয়। কখন যে পৌঁছে গেলাম প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে খেয়াল করিনি। দিন শেষ হয়ে রাত হতেই চাঁদের আলোয় লাংটাং লিরুং-কে খুব মোহময়ী লাগছিল।

পরদিন কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। ৎসেরগো রি সামিট করার দিন। তিনজনের পদযুগলই জবাব দিলেও আমাদের পালস রেট নরমাল থাকায় বিশেষ অসুবিধা হল না। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ভোর চারটে নাগাদ রওনা দিলাম। প্রায় ১২০০ মিটার এলিভেশন ডিফারেন্স। পথে সেই নদীর সঙ্গে দেখা। চাঁদের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে যাচ্ছি। অক্সিজেন নিয়ে কোনও সমস্যা হয় নি। কিন্তু হাওয়ার প্রবল বেগ বেশ মুশকিলে ফেলছিল। অবশেষে সকাল ৭.৩২ মিনিটে আমাদের বহু প্রত্যাশিত মুহূর্ত এল। আমরা ৎসেরগো রি টপ (৪৯৮৪ মি) সামিট করলাম। ভাবিনি পারব। একটু ডানদিক যেতেই দেখলাম ল্যাংটাং গ্লেসিয়ার - ল্যাংটাং খোলার উৎপত্তি স্থল। আর দেখলাম আকাশ জুড়ে ল্যাংটাং লিরুং, ল্যাংটাং রি, গাঙচেঙপ আর গাঞ্জালা পাস।

ঘোড়েতাবেলা থেকে দেখা ল্যাংটাং -২ শৃঙ্গ

জ্যোৎস্নাস্নাত মোহময়ী ল্যাংটাং-১

এবার নামার পালা। নীচে নেমে শেষবারের মত অনেকক্ষণ কথা হল ল্যাংটাং খোলার সঙ্গে। উঠে আসার আগে বললাম, আবার ফিরে আসব, অপেক্ষায় থেকো।

কায়ানজিং গ্রাম

~ *ল্যাংটাং-গোঁসাইকুণ্ড ট্রেকরুট ম্যাপ* ~ *ল্যাংটাং-এর আরও ছবি* ~

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সৌম্যদীপ হালদার বর্তমানে একটি কলেজে শিক্ষকতা করেন। নেশা বেড়ানো ও ছবি তোলা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

এবার ভুটান

দেবাশিস বসু

~ ভুটানের তথ্য ~ ভুটানের আরও ছবি ~

এবার গেছিলাম ভুটানে। ব্যবস্থাপনায় মুম্বাইবাসী বন্ধু শ্রীমান রুদ্র ও তার সহযোগীরা। দলের নাম 'মিলন মঞ্চ ট্র্যাভেলস।' মুম্বাই, দিল্লি, বেংগালুরু ও কলকাতা থেকে সমাগত দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই প্রবীণ-প্রবীণা, মোট তেইশজন। ২৬ মার্চ ২০১৬ শেয়ালদা থেকে রওনা হলাম; দুপুরে পৌনে দুটো নাগাদ, তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে। আমরা যে সবাই একসূত্রে বাঁধা পড়ে ছিলাম ও তা এখনও অটুট আছে, আর হয়তো থাকবেও, তার কারণ সবাই বেড়াতে ভালবাসি। সকলেই প্রবীণ হলেও কিন্তু হৈ-চৈ কম হয় নি।

পরের দিন ২৭ মার্চ সকালে নিউ আলিপুরদুয়ার পৌঁছালাম। আকাশ সামান্য মেঘলা থাকলেও দলের সদস্যেরা মানসিকভাবে তারুণ্যে ভরপুর। বেড়ানোর আনন্দে, কারও পোষা হাঁটুর ব্যথা, কারও কোমর ব্যথা, কারও মাথা ঝিমঝিম কিম্বা কারও বুক ঢিপঢিপ - সব বেমালুম গায়েব। আমাদের জন্য একটা বাস ও একটা গাড়ি নিয়ে হাজির তিনজন সদাহাস্যময়, মিশুকে ও পরিশ্রমী ভুটানি যুবক। গাইড শ্রীমান বিষ্ণু, বাসচালক শ্রীমান সুরেশ ও ট্যুর অপারেটর সংস্থার মালিক এবং গাড়ির ড্রাইভার শ্রীমান কেলভিন। ওদের সঙ্গ ও ব্যবহার খুবই আনন্দদায়ক হয়েছিল আমাদের কাছে।

যাই হোক, সকাল পৌনে আটটা নাগাদ নিউ আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন থেকে রওনা হলাম। পথে পড়ল হাসিমারা, জয়গাঁও - এই অবধি ভারতবর্ষ, এরপরে ভুটানে ঢুকব। একটা সুন্দর পাকা তোরণ পেরোলাম – এটাই ভুটানের প্রবেশপথ। ওপারে ফুন্টশোলিং। তোরণ পেরোবার মিনিট তিন-চার পরে, সকাল সাড়ে নটা নাগাদ পৌঁছালাম হোটেল অর্কিড-এ। খানিক আড্ডা, খাওয়া দাওয়া আর একটু বিশ্রাম নিয়ে শহর দেখতে বেরোলাম।

তোরণ পেরিয়ে ফুন্টশোলিং-এ

হিমালয়ের দক্ষিণাংশে সবুজ গাছ-গাছালি, তুষারাবৃত রজতশুভ্র শৃঙ্গরাজি, দুরন্ত পাহাড়ি নদী, ঝরনা, সাইপ্রাস, পাইন, চেরি, আপেল ইত্যাদি গাছের সমারোহ, আর ঝকঝকে নীল আকাশ, রাতে তারাদের চাঁদোয়া এইসব নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবির মত দেশ, ভারতের প্রতিবেশী, পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া, ছোট্ট ভুটান।

বেরোতে বেরোতে প্রায় বেলা দেড়টা বেজে গিয়েছিল, আবহাওয়া কিঞ্চিদধিক গরমের দিকেই। রাজপরিবারের অন্যতম প্রাসাদ, একটি গুম্ফা আর ঘড়িয়াল প্রজনন ও রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র ঘুরে, বিকেল সাড়ে তিনটেয় হোটেলে ফিরলাম। ঘন্টা দুয়েকের সান্ধ্যবাসরে জড়ো হলাম এরপরে, একে অপরের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য। আলাপ-পরিচয় সারা হলে হট ড্রিংকসের সঙ্গে গান, কবিতা, ম্যাজিক ইত্যাদি নিয়ে আসর সরগরম হয়ে গেল।

২৮ মার্চ ২০১৬, সোমবার। আবহাওয়া শেষ রাত্তির থেকে বেশ খারাপ - প্রবল ঝড় আর সেইসঙ্গে বৃষ্টি। আকাশ গুরুগম্ভীর আর তার প্রতিফলন আমাদের মুখেও। আজ যেতেই হবে ইমিগ্রেশন অফিসে পারমিটের জন্যে। যাইহোক শেষপর্যন্ত আকাশের মুখ প্রসন্ন হল, সেই সঙ্গে আমাদেরও। ভিড় থাকলেও বেলা এগারটার মধ্যেই পারমিট মিলল সকলেরই। হোটেলে ফিরে বাসের মাথায় লাগেজ তুলে, ফুন্টশোলিংকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে প্রথমেই রিনচেনডিং ইমিগ্রশন চেকপোস্টে পারমিট দেখাতে হল। গেদুতে টি ব্রেক। ডিলাক্স টু কিং রেস্তোঁরায় লাঞ্চ শেষ হতে হতে বিকেল তিনটে বেজে গেল। ছাপছা পেরিয়ে তালালুং চেক পোস্টে ফের ফের একবার পারমিট চেকিং-এর পালা মিটিয়ে থিম্পুর হোটেলে ঢুকতে সন্ধে ছটা বেজে গেল। সান্ধ্যআসর, ডিনার সেরে বিশ্রামের পালা।

২৯ মার্চ, মঙ্গলবার। সকাল সাড়ে নটায় ব্রেকফাস্ট সেরে থিম্পু থেকে বেরোনো হল। প্রথম গন্তব্য পাহাড়ের ওপর কুয়েনসেল ফোদরং নেচার পার্ক। এখানে হংকং-এ তৈরি ব্রোঞ্জের ভুটানি গঠনশৈলীর বিশ্বের অন্যতম উঁচু বুদ্ধমূর্তিটি (৫১ মিটার) দেখে দারুণ লাগল। সূর্যের আলোয় সোনার মতো চকচক করছে মূর্তিটি। এই বুদ্ধমূর্তির বেদীতে ব্রোঞ্জের প্রচুর ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তি আছে, গাইডের কথানুসারে ৮ ইঞ্চি মূর্তির সংখ্যা ১ লক্ষ ও ১২ ইঞ্চির ২৫ হাজারটি। ৩১০০ মিটার উঁচু দোচুলা পাস-এ পৌঁছালাম দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ। ছবির মতো দৃশ্য চারপাশের। চলার পথে কুমার রেস্তোঁরায় দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারা হল। পরবর্তী গন্তব্য পুনাখা জং। পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে এল। এই জং ভুটান দেশটির প্রতিষ্ঠাতা জাহবদ্রুং রিমপোচে নগয়াং নামগিয়েল ১৬৩৭ সালে তৈরি করান, ফো-চু ও মো-চু দুই নদীর সঙ্গমস্থলে এটির অবস্থান - পোশাকি নাম পুংতাং ডেচেং ফোতরাং। এখানে একটি সুন্দর সোনার বুদ্ধমূর্তি আছে।

কুয়েনসেল ফোদরং নেচার পার্কে বুদ্ধমূর্তি

৩০ মার্চ, বুধবার। সকাল সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। পথেই ব্রেকফাস্ট। ২৮৮৫ মিটার উঁচু পিলে লা পাস পৌঁছে শুধু প্রকৃতির দিকে চেয়ে মুগ্ধ হওয়া। পথে ধ্বসে বন্ধ হয়ে যাওয়া রাস্তায় দুবার আটকা পড়লাম। পথের শেষে আরেকটা নাম না জানা পাস-এ কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফেরা।

জাম্বে লাখাং

৩১ মার্চ, বৃহস্পতিবার। আজকের প্রথম গন্তব্য জাম্বে লাখাং - ভুটানিদের উপাসনাস্থল। সপ্তম শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন তিব্বতী রাজা সংগতসেন গাম্পো। মন্দিরের বাইরে নানান ভুটানি হস্তশিল্পসম্ভার বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে নানা মাপের বিশেষ ধাতুর বাটি আর তার সংগে কাঠি। বাটির ধারে ঐ কাঠি ছুঁইয়ে আস্তে আস্তে ঘোরালে সুন্দর মিষ্টি আওয়াজ শোনা যায়, যার সঙ্গে মিল আছে "ওম্ মণিপদ্মে হুম" মন্ত্রোচ্চারণের। এরপর কুর্জে লাখাং। কথিত আছে গুরু রিমপোচে এখানে তপস্যা করেছিলেন ও তাঁর পদচিহ্ন সংবলিত পাথরটি প্রতিষ্ঠিত। এখানে সব মিলিয়ে তিনটি বৌদ্ধ মন্দির। আরও জানা গেল, কাছের একটি জলাশয়ও গুরু রিমপোচে তৈরি করেন। যার জল স্থানীয় অধিবাসীরা খুব পবিত্র বলে বিশ্বাস করেন। পরের গন্তব্য তামসিং লাখাং ও তারপর এখানকার বিখ্যাত চিজ ও ওয়াইন ফ্যাকটরি এবং বিক্রয়কেন্দ্র। পথে লাঞ্চ সেরে পৌঁছলাম বার্নিং লেক, যাকে ভুটানি ভাষায় বলে 'মেবার শো (Mebar Tsho)'। কথিত আছে যে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে টের্টন পেমা লিংপা নামের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখতে পান যে শত শত বছর আগে গুরু রিমপোচে এই জলাশয়ে কিছু পবিত্র সম্পদ লুকিয়ে রেখে গেছেন। স্থানীয় শাসক ও বাসিন্দারা তাঁর কথা বিশ্বাস না করায় সন্ন্যাসী জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে ওই জলাশয়ে ডুব দেন। কিছুক্ষণ পরে একটি মূর্তি, পুঁথি ও মড়ার খুলি নিয়ে জল থেকে উঠে আসেন। তখনও জ্বলছিল সেই প্রদীপ। তারপর থেকে জলাশয়টির এইরকম নামকরণ হয়। ভুটানিদের অন্যতম তীর্থ এই লেক।
আজ বেশ কিছু নতুন শব্দের অর্থ জানলাম। লাখাং (Lhakhang) - বৌদ্ধ মন্দির বা উপাসনাগৃহ। গুম্ফার চেয়ে তুলনামূলক ভাবে ছোট। চোর্তেন - বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্মৃতিতে নির্মিত বিশেষ আকৃতির স্থাপত্য। জং(Dzong) - প্রশাসনিক দপ্তর, ভুটানিদের উচ্চারণে জোংখা (Dzongkha)।

১ এপ্রিল ২০১৬, শুক্রবার। সকাল আটটা নাগাদ বুমথাং থেকে রওনা হলাম। পথে একটি হস্তশিল্পের দোকানে ঘুরে দেখে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কেউ কেউ কিছু কেনাকাটাও সেরে নিলেন। আশেপাশে প্রচুর সাদা ও ম্যাজেন্টা রং-এর চেরিফুলে গাছ ভরে আছে। ছোট জনপদ ট্রোংসাতে ছোট্ট একটা বিরতি হল পথে, পারমিট চেক হল। সোয়া ছটা নাগাদ পৌঁছালাম ফোবজিখা ভ্যালির হোটেল তাশিলিং-এ।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। অক্টোবরের শেষের দিকে তিব্বত থেকে আসা পরিযায়ী পাখিদের শীতের ঠিকানা এই জায়গা। যার মধ্যে অন্যতম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে আসা ব্ল্যাক নেকড ক্রেন(Black-necked crane)। ভুটানের রাজার তত্ত্বাবধানে ও জাপান সরকারের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে রয়্যাল সোসাইটি ফর দ্য প্রোটেকশান অফ নেচার-এর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। চারধারে সবুজ পাহাড় ঘেরা, সুদূর বিস্তৃত সবুজ এই উপত্যকা, মাঝে দুটি পাহাড়ি নদীর শীর্ণ ধারা - নাকে চু আর ফাগ চু। এই ভ্যালি-পাহাড়, নদী, বাড়িঘর, সবুজের নানা শেড নিয়ে যে ল্যান্ডস্কেপ, তা নাকি সুইৎজারল্যান্ড বা স্কটল্যান্ডের চেয়েও সুন্দর, এই রকম শোনা গেল কয়েকজন সহযাত্রীদের কাছে। এই মরসুমে ভর সন্ধ্যেবেলায় অবশ্য আমরা একটাও জ্যান্ত পাখি দেখতে পাইনি। খোলা আকাশের নিচে ব্ল্যাক নেকড ক্রেনের একটা প্রতিমূর্তি দেখেই সন্তুষ্ট হতে হল। তবে সবচেয়ে ভালো লাগল ছোট একটা অডিটরিয়ামে দেখা পরিযায়ী পাখিদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ওপর সুন্দর ডকুমেন্টারি ফিল্মটি।

২ এপ্রিল - শনিবার। সকালে কাছেই এক বুদ্ধমন্দির থেকে ঘুরে এসে, জলখাবার সেরে রওনা হলাম। আবার পথ চলা, যদিও হেঁটে নয়, বাস ও গাড়িতে। রাস্তা যথেষ্ট ভাল, আশপাশের প্রকৃতিও খুব সুন্দর। তবু পথের ক্লান্তি দূর করতে গাড়ির মাইকে গান, কবিতা, গল্পবলা ইত্যাদি চলতে থাকে। দুপুরে মেসিনা নামে একটা জায়গায় লাঞ্চ। প্রায় বেলা তিনটে নাগাদ দো-চু লা পেরোলাম। থিম্পুকে এড়িয়ে বাইপাস ধরে সোজা পারো এয়ারপোর্ট। উঁচু রাস্তার ডানদিকে পারো নদীর ধারে বেশ নিচে, ছোট হলেও খুব সুন্দর বিমান বন্দরটি। ঠিক যেন পিকচার পোস্টকার্ড কিংবা অত্যন্ত কুশলী হাতে সাজানো ঝুলনের দৃশ্য।

ফোবজিখা ভ্যালি

৩ এপ্রিল - রবিবার। হোটেলে জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সকাল সকাল। খানিক বাদেই যে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছালাম, তার নাম - কপার কালার মাউন্টেন। খানিকটা ঘেরা ঢাকা জায়গার

পারো এয়ারপোর্ট

নীচে কয়েকটা সিমেন্টের বেদীর মত করা আছে, যেমন অনেক বাজারে থাকে। সেখানে স্থানীয় হস্তশিল্পের নিদর্শনস্বরূপ পুঁথি ও পাথরের মালা, ধাতুর বুদ্ধমূর্তি এসব বিক্রি হচ্ছে। এর পরেই যে ট্রেকিং পথের শুরু তা যাবে তাকশাং মনাস্ট্রি বা টাইগার নেস্টে। অনেক উঁচুতে, বেশ দূরে এই মনাস্ট্রি দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পুরো মনাস্ট্রিটাই পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে বা ঝুলছে। শোনা যায়, দ্বিতীয় বুদ্ধ বলে খ্যাত অষ্টম শতকের ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মগুরু রিমপোচে বা গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বত থেকে বাঘিনীর পিঠে সওয়ার হয়ে উড়ে এসেছিলেন ও এই জায়গাটিকে ধ্যান করার জন্য উপযুক্ত স্থান বলে বেছে নিয়েছিলেন। এই দুরূহ ও ভয়ঙ্কর সুন্দর সুপ্রাচীন মনাস্ট্রিটি গড়ে ওঠে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ১৯৯১ সালে এক বিধ্বংসী আগুনে তা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে, তৎকালীন রাজা জিগমে সিগমে ওয়াংচুক, সাত বছর ধরে ১৩৫ মিলিয়ন নগুলত্রাম (ভুটানি টাকা) খরচ করে আবারও তৈরি করান। ২০০৫ সাল থেকে আবার দর্শনার্থীদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। ভুটানে এসে এই স্থান অবশ্যই দ্রষ্টব্য, কিন্তু পথ মোটেই সহজ নয়। একদিকে প্রায় সবটাই গভীর খাদ, অন্যপাশে খাড়া পাহাড়, মাঝে শীর্ণ রাস্তা বা সিঁড়ি। মনের জোর, বুকের জোর আর পায়ের জোর যথেষ্ট বেশি থাকলে, তবেই চেষ্টা করা ভাল। উঠতে অন্তত ঘন্টা তিনেক ও নেমে আসতে আরও ঘন্টা দুয়েক লাগতেই পারে। আমাদের মধ্যে চারজন সাড়ে দশটায় রওনা হয়ে, ফিরেছেন সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ। পারোর উচ্চতা মোটামুটি ২২০০ মিটার, মনাস্ট্রিটি আরো প্রায় ৯০০ মি উঁচুতে।

দলের বাকি যারা যাইনি বা যেতে পারিনি, তারা সারাদিনে অন্য কয়েকটা জায়গা ঘুরে নিলাম। প্রথমে গেলাম দ্রুকগিয়েল জং। এই জং-টি তৈরি করান ভুটান দেশটির প্রতিষ্ঠাতা জাহবদ্রুং রিমপোচে নগয়াং নামগিয়েল, ১৬৪৯-এ। এটিও আগুনে পুড়ে যায় ১৯৫১-য়, পরে সংস্কার করা হয়। পরে আরেকটি জং-এ যাওয়া হল - নাম মনে নেই, খুব সম্ভব রিনপুং জং। এখানে বাইরের চত্বরে চেরি ও অন্যান্য খুব সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ আছে। ভেতরের চত্বরে বা উঠোনে, ফুলগাছের পাশাপাশি কমলালেবু গাছও আছে আর তাতে ফলও ধরেছে। এখান থেকে গেলাম তা-জং বা ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখতে। এটি একটি গোলাকার স্থাপত্য, অনেকটা দুর্গের দেওয়ালের কোণে যেমন থাকে। আসলে এটি তৈরি হয়েছিল রিনপুং জং-কে রক্ষা করা ও নজরদারির জন্য। ১৯৬৭তে একে দ্বিতীয় সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করা হয়। অন্যান্য মিউজিয়ামে যা যা থাকে, এখানেও মোটামুটি তা-ই আছে। যেমন প্রাচীন মূর্তি, পোষাক পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র আর অতীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র। বিকেল সোয়া চারটে নাগাদ হোটেলে ফিরে ট্রেকিং টিমের জন্য অপেক্ষা করা। তারা ফিরে এলে সান্ধ্যআড্ডাটা বেশ জমে উঠল।

৪ এপ্রিল, সোমবার। হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে, ৪০ কিমি. পথ পেরিয়ে, পৌঁছালাম চেলে-লা বা চেলে পাস, উচ্চতা ৩৮৮৮ মিটার। বেশ জোরে ঠান্ডা হাওয়া, যথেষ্ট গরম জামা ভেদ করে, হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল। এবার ২৮ কিমি পথ পেরিয়ে হা জনপদে পৌঁছালাম। উচ্চতা ২৫০০ মিটার। থাকা হোটেল রিসুম রিসর্টে। এখানে এসেছি আমরা বেলা দেড়টায়। লাঞ্চের পরে বেরিয়ে পারো নদীর ধারে গেলাম। এখানে একটা ঝোলা ব্রিজ আছে, আর একটা ছোট টাওয়ার - যার ওপর উঠে আশপাশের দৃশ্য দেখা যায়। প্রায় সামনে রাস্তার উল্টোদিকে খেলার মাঠ ও কয়েকটি বিল্ডিং নিয়ে বিশাল কমপ্লেক্সে একটি কো-এড স্কুল রয়েছে। আর আছে ছোট একটি বাজার।

৫ এপ্রিল, মঙ্গলবার। আজ আমাদের দীর্ঘ পথ - ২৩৩ কিমি যেতে হবে। তাই ভোর সাড়ে পাঁচটাতেই রওনা দিলাম। মনটা বেশ খারাপ, ভুটান বেড়ানো প্রায় শেষ। চলার পথে, সকাল নটা নাগাদ আধ ঘন্টার বিরতি প্রাতঃরাশ ও চা-এর জন্য। আবার একটা চেক পোস্ট। গেদু পেরোলাম পৌনে বারোটায়। রিনচেনডিং চেকপোস্টে পৌঁছতে দুপুর একটা বাজল। ফুন্টশোলিং-এ সেই হোটেল অর্কিডে পৌঁছে গেলাম তার পরেপরেই। মিনিট দশেকের বিরতির পরে ভুটানকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম।

জয়গাঁও-এ বৃষ্টি আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। লাঞ্চ খেয়ে রওনা। গ্রীন টাচ ডুয়ার্স ইকো রিসর্টে পৌঁছতে বিকেল হল। সুন্দর ব্যবস্থা, চারদিকে চা বাগান। এবারকার বেড়ানোর অদ্য শেষ রজনী, তাই সান্ধ্যআসর আরও জমজমাট। রাতে ভুরিভোজের ব্যবস্থাও ছিল।

শেষে কিছু জরুরি তথ্য জানিয়ে রাখি –

১) ভুটানের প্রবেশপথ সড়কপথে পশ্চিমবঙ্গের জয়গাঁও বা জয়গাঁ দিয়ে, অথবা আকাশপথে পারো দিয়ে।

২) ভারতীয়দের ভুটান যেতে পাসপোর্ট লাগে না, তবে লাগে পারমিট বা অনুমতিপত্র। এই পারমিট পাওয়া যাবে ফুন্টশোলিং-এর ইমিগ্রেশন অফিস থেকে। পারমিটের জন্য জমা দিতে হবে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণস্বরূপ পাসপোর্ট/ভোটার আই ডি কার্ডের ফটোকপি ও দুটি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি। সঙ্গে অবশ্যই রাখতে হবে অরিজিনাল পরিচয়পত্রটি। এই পারমিট পাওয়া যাবে কলকাতার ভুটান কন্স্যুলেট অফিস, টিভোলি কোর্ট, ১ এ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের অফিস থেকেও। কিন্তু কলকাতার পারমিট থাক বা নাই থাক, ভুটানে পৌঁছে যাত্রীকে ইমিগ্রেশন অফিসে বায়োমেট্রিক টেস্টের জন্য যেতেই হবে। ফুন্টশোলিং-এ পারমিট দেওয়া হয় সোম থেকে শুক্র, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা ও দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা (ভুটান সময় - যা ভারতীয় সময় থেকে আধঘন্টা এগিয়ে)। পারমিট মুখ্যত থিম্পুর জন্য। থিম্পু ইমিগ্রেশন অফিসে সেটি দেখিয়ে, পুণাখা, হা, বুমথাং ইত্যাদি জায়গার জন্য পারমিট করাতে হবে, তবে, এর জন্য বেশি সময় লাগে না। ছবি ও পরিচয় পত্রের কয়েকটি বাড়তি কপি সঙ্গে রাখা ভাল।

৩) পারমিটের জন্য দরখাস্তে, ভুটানে কতদিন থাকতে চাই জানিয়ে যে তারিখ লিখতে হয়, তাতে ওখানে থাকার সময় ৫/৭ দিন বাড়িয়ে লেখা ভাল, কারণ উল্লিখিত তারিখ পেরিয়ে গেলে জেল বা বড় রকমের আর্থিক জরিমানা হতে পারে।

৪) ভারতীয় টাকা ও ভুটানি নগুলত্রাম সমান। মুদ্রা বিনিময়ের দরকার নেই। সব জায়গায় ভারতীয় টাকা চলে।

৫) ভুটানে প্রায় সর্বত্র পলিথিন প্যাকেট ব্যবহার ও ধূমপান নিষিদ্ধ।

৬) ভুটানে ভারতীয় মোবাইল সিম কাজ করে না, প্রয়োজনে ভুটানি সিম কার্ডের জন্য গাইডের পরামর্শ নিন।

৭) কোথাও ফটো তোলা যাবে কি যাবেনা তার জন্যও গাইডের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

সড়ক দূরত্ব -

ফুন্টশোলিং - থিম্পু - ১৭৬ কিমি, থিম্পু - পুনাখা - ৭৭ কিমি, পুনাখা - বুমথাং - ২০৮ কিমি, বুমথাং - ফোবজিখা - ৬৮ কিমি, ফোবজিখা - পারো - ২৫৩ কিমি, পারো - চেলে লা - ৪০ কিমি, চেলে লা – হা - ২৮ কিমি, হা - ফুন্টশোলিং - ২৩৩ কিমি

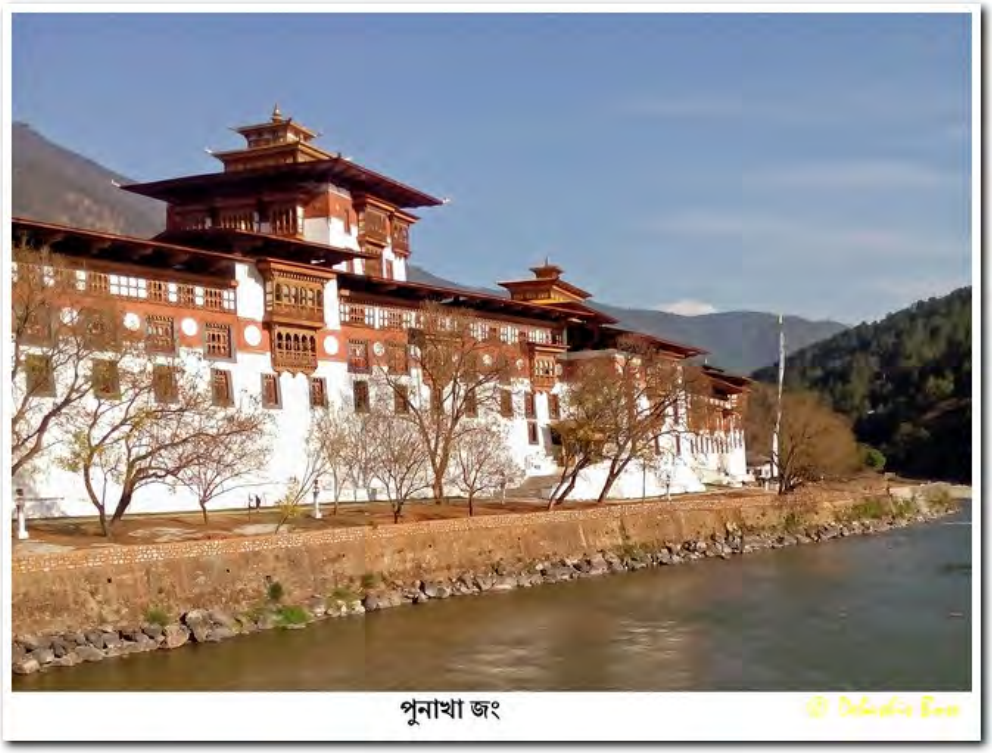

পুনাখা জং

~ ভুটানের তথ্য ~ ভুটানের আরও ছবি ~

রেলের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার দীর্ঘদিন পরও ঊনআশি বছরের তরুণ দেবাশিস বোসের একটা বড় সময় কাটে ভ্রমণেই।

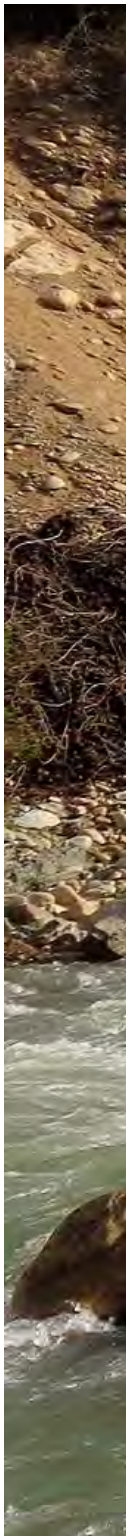

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

মুন্নারের মায়ায়

দেবতোষ ভট্টাচার্য

~ মুন্নারের আরও ছবি ~

দুপুরে জমিয়ে মাংসভাত খেয়ে ভাতঘুম দেওয়ার তোড়জোড় করছি, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। হ্যালো বলার আগেই ওপারে উত্তেজিত গলা - 'দেবতোষদা, ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে! অবন্তীর খুব ইচ্ছা মুন্নার যাওয়ার - তুমি একটু ব্যবস্থা কর প্লিজ।' সম্মতি বা আপত্তি কোনোটারই অপেক্ষা না করে ফোনটা কেটে দিল শালাবাবু।

সস্ত্রীক এই প্রথম আসছে, তাই আলিস্যি ঝেড়ে ক্যালেন্ডারে চোখ রাখলাম। মুন্নার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে এক অপরূপ হিল স্টেশন - কেরালায়। নভেম্বরে দিনক্ষণ ঠিক করে টিকিট কাটতে বসলাম - আজকাল লটারি পাওয়াও বোধ হয় এর চেয়ে সোজা। নাহ্, কপাল ভালোই ছিল বলতে হবে - কন্যাকুমারী এক্সপ্রেসে এর্নাকুলাম পর্যন্ত যাওয়ার টিকিট জুটে গেল।

খুব তাড়াতাড়িই যেন যাওয়ার দিন এসে গেল। শুরুতেই যেন ভূমিকম্প - মোদীজির ডিমনিটাইজেশন! একরাশ চিন্তা নিয়ে উপস্থিত হলাম ব্যাঙ্গালোর সিটি স্টেশন - এখান থেকেই সন্ধ্যায় ছাড়বে আমাদের কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস। নিজেদের বার্থ খুঁজে বসলাম। ডিনার বলতে রেলেরই ঝাল ঝাল এগ বিরিয়ানি - উহুহুহু করতে করতে যে যার মত শোওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলাম।

পরদিন ভোর। হোটেলে কথা বলে গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। ড্রাইভার সাহেবের পরামর্শ মতো নেমে পড়লাম আলুভায়, এর্নাকুলামের ঠিক আগের স্টেশন। এতে ঘন্টাখানেক সময় বাঁচে। রাস্তায় জলখাবার খেয়ে গাড়ি যখন মুন্নারে পৌঁছাল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে আজকের দিনটা জিরিয়ে নেওয়াই ঠিক হল।

পরদিন সকালে হোটেলেই জলখাবার সেরে বেড়িয়ে পড়লাম - গন্তব্য পল্লিভাসল্। সবুজের যে এতরকম বাহার হয় তা আগে ধারণা ছিল না। এই চাবাগানে ঘেরা পাহাড়েই অবস্থিত কেরালার প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। চোখে সবুজের ঘোর নিয়ে এগোলাম দেবীকুলামের দিকে। এইখানেই আছে নয়নাভিরাম লকহার্ট চাবাগান - এদের উৎপাদনের পুরোটাই রপ্তানি হয়। কুড়ি টাকার টিকিট কেটে চাবাগানের ভেতর হৈ হৈ করে ঢুকে পড়লাম সবাই। হালকা মেঘের চাদরে মোড়া সে যেন এক রহস্যময়ী সুন্দরী। সূর্যও যেন লজ্জায় মুখ ঢেকেছে। ফিরতে কারোরই মন চাইছিল না, কিন্তু দেরী হয়ে গেলে দেবীকুলাম জলাধারটি আর দেখা যাবে না। অগত্যা ভাললাগার ঘোর নিয়েই এগিয়ে চললাম।

সবুজে ঘেরা দেবীকুলাম জলাধারটি অতি মনোরম। উচ্চতা কম হওয়ার দরুণ একটু গরমই যেন অনুভব হয়। এখানে বোটিং-এর দারুণ বন্দোবস্ত। ফিরে আসার পথে আমরা টিকিট কেটে ঢুকলাম লকহার্ট চা ফ্যাক্টরিতে। সেদিন গ্রীন টি তৈরি হচ্ছিল - যে চা রোজ সকালে ঘুম ভাঙ্গায় তার প্রস্তুতপ্রণালী চাক্ষুষ করা এক অন্য অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয়দিন সবাই মিলে প্রথমেই গেলাম মাত্তুপেট্টি হ্রদে। চতুর্দিক নানারঙের পাহাড়ে ঘেরা, আর তাতে অবিরত চলছে রৌদ্রছায়ার মায়ার খেলা। এখানেই স্পিডবোটে চড়ে নিলাম - গতি আর প্রকৃতির এক অদ্ভুত মিলন। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে অপূর্ব এক ইকো পয়েন্ট। সবাই গলা চড়িয়ে পরীক্ষা করে নিলাম ভাল করে।

পরবর্তী গন্তব্য কুণ্ডলা হ্রদ - উঁচু পাহাড়ে ঘেরা এক কৃত্রিম জলাধার। অনেকক্ষণ লুকোচুরির পর মেঘ যেন ধরা দিল। শীতের বৃষ্টি গায়ে মেখে রওনা হলাম মুন্নার এলাকার সর্বোচ্চ স্থান টপ স্টেশনের দিকে। প্রায় ১৭০০ মিটার উঁচু মুন্নার কোদাইকানাল রোডের ওপর এই টপ স্টেশন। বেশ শীত অনুভব করতে লাগলাম, কিন্তু মেঘে ঢাকা পশ্চিমঘাটের এই রূপ যেন ভোলার নয়। ফিরেই গেলাম দেখতে কলারিপায়াতু - কেরালার এক প্রাচীন মার্শাল আর্ট। শিল্পীদের শারীরিক কসরৎ দেখবার মত। গায়ে কি কাঁটা দিয়ে উঠেছিল - কে জানে!

পরদিন ফেরার পালা। এক স্পাইস গার্ডেন থেকে কেনা হল নানা মশলা। ফেরার ট্রেন সেই কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস, তবে এবার এর্নাকুলাম থেকেই। ট্রেন লেট ছিল - তা থাকগে, কারোরই তখন সেসব ভাবতে ইচ্ছা করছিল না। মুন্নারের মায়ায় সবাই তখন আচ্ছন্ন।

~ *মুন্নারের আরও ছবি* ~

প্রবাসী বাঙালি দেবতোষ ভট্টাচার্য কর্মসূত্রে আজ বহু বছর বাঙ্গালোরের বাসিন্দা। ফটোগ্রাফির প্রবল নেশা - আর এই নেশার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায়ই তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয় ঘর ছেড়ে। অবসর সময়ে অল্পবিস্তর লেখালেখির বদভ্যাস থাকলেও, এটিই তাঁর প্রথম ভ্রমণকাহিনি। লেখার মাধ্যমে যদি একবার বেড়াবার নেশাটি কাউকে ধরিয়ে দেওয়া যায় তবে সেটাই হবে তাঁর মস্ত পাওয়া।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

ক্ষণিকের অতিথি

সৌম্য প্রতীক মুখোপাধ্যায়

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে মন্দাকিনীর কিনারা ধরে কেদারনাথের পথে ৮ কিলোমিটার যেতেই গাড়োয়াল মন্ডল বিকাশ নিগমের নতুন ঠিকানা তিলওয়ারা। বছর চারেক আগের উত্তরাখণ্ডের মারণবন্যাতে বিধ্বস্ত কেদারনাথের পথের পুরোটা এখনও ঠিক হয়ে ওঠে নি, রাস্তা ছাড়াও বহু পর্যটন আবাস ধ্বংস হয়ে যায় সেই সময়েই। তারপর আবার গড়ে উঠছে নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র। তিলওয়ারা তাদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য সে এখনও স্থান করে নিতে পারেনি ভ্রমণগাইড বইগুলিতে।

হরিদ্বার বা হৃষীকেশ থেকে কেদার-বদরির দিকে অথবা কেদার থেকে বদরি (বা তার উল্টোটা) যাওয়ার সময়ই একরাত্রি কাটানোর জন্য তিলওয়ারা আদর্শ স্থান। হরিদ্বার থেকে ঘণ্টা সাতেকের মধ্যে তিলওয়ারা পৌঁছে যাওয়া যায়।

বেশ কিছুটা পরিসর নিয়ে গড়ে উঠেছে নিগমের অতিথিশালা - পাহাড়ের ধাপ বরাবর। সেখানে ছড়ানো ছিটানো বাংলো ধরনের কতকগুলি থাকার স্থান। অতিথিশালার বেশ কিছুটা ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে কেদারনাথ যাবার রাস্তাটি। আর নীচে গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে পাহাড় ভেঙে নামলেই মন্দাকিনী নদীর কিনারা। গাড়ির আওয়াজ এখানে পৌছয়ই না। কান পাতলে শোনা যাবে পাখির কাকলি। আর নিত্যসঙ্গী হবে কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদীর শব্দ।

মন্দাকিনীর নদীতটটিকেই কেন্দ্র করে অতিথিশালার বিকাশ। মূল জনপদটি কিছুটা দূরে। আশপাশে কোনও বসতি নেই। সর্বক্ষণের একমাত্র সঙ্গী নিস্তব্ধতা। এখানে নেই কোনও দিগন্তবিস্তৃত সবুজের গালিচা, বরফে আবৃত পাহাড়চূড়ো অথবা কোনও নীল জলের হ্রদ। অথচ এই নেই-গুলি নিয়েও যেন তিলওয়ারা সুন্দর। প্রচারের আলো থেকে দূরে পড়ে থাকা এক শান্ত পার্বত্য গ্রাম ব্যতীত আর কোনও পরিচয়ই নেই তিলওয়ারার। নিগমের এই থাকার স্থানটি সেই আস্বাদ নেওয়ার একটা সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রকৃতি যেন কিছুটা কৃপণই এখানে। মন্দাকিনী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত - তার ধার বরাবর দুটি গিরিখাত উঠে গিয়েছে। পশ্চিম পাড়ের গিরিখাতটি অনেকটাই লম্বালম্বিভাবে উঠেছে নদীর কূল থেকে। আর পূর্ব পাড়ের গিরিখাতটি বেশ খানিকটা দূরে। নদীতীর সেখানে বেশ প্রশস্ত - অসংখ্য ছোট বড় নুড়ি পাথরে ভরা। সেটি অতিক্রম করলেই অতিথিশালাটি। আকাশ এখানে একফালি - চারদিক পাহাড়ে ঘেরা - দিকচক্রবাল দর্শনের কোন সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত কোনোটিই দেখা যায় না।

তাই বলে ঘরের মধ্যে সময় কাটানো উচিত নয় একেবারেই। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম। বুক ভরে তাজা হাওয়া নিতে নিতে পশ্চিমদিকের দেওয়াল টপকে নেমে গেলাম নদীতটে। নামার আগে ভেঙে নিলাম একটা গাছের ডাল - দাঁতন। নুড়ি-পাথরের ওপর দিয়ে নিজেকে সামলাতে সামলাতে চলে এলাম নদীর পাড়ে। স্পর্শ করলাম বরফগলা হিমশীতল জল। স্রোতস্বিনীর সেই জলধারা থেকে আঁজলা ভরে জল নিয়ে ভালো করে হাত মুখ পা ধুয়ে নিলাম । এইরকম সুযোগ তো বারবার আসবে না আমাদের এই শহুরে জীবনে।

নদীর পূর্বপাড়ে বসে চোখে পড়ল পশ্চিম পাড়ের খাড়াই - ধ্বসে জীর্ণ গিরিখাতের দিকে। আপাতভাবে আকর্ষণবর্জিত হলেও দেখা মিলল হরিণপালের। সকালে জল খেতে নেমে আসে তারা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসে একদল বানর। জলপানের থেকেও হরিণদের জ্বালাতন করাই যেন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য! লোকালয় দূরে বলে বন্যপ্রাণীগুলি বেশ নিশ্চিন্তে নিজেদের মনে ঘোরাফেরা করে। অনেকটা দূরে একটি মন্দির আছে। যদিও মনে হয় না কেউ বড় একটা আসে সেদিকপানে। জঙ্গলের মধ্যে থেকে উড়ে আসে পাখি - কিছু জানা, কিছু না জানা। তারা উড়ে চলে এপাড় হতে ওই পাড়ে। ভিড় করে অতিথিশালার চত্বরেও। চঞ্চল এই পাখির দলকে ক্যামেরা বন্দি করা বেশ কষ্টকর।

নদীর পাড়েই পড়ে আছে বিশাল দু-তিনটে পাথর। ধ্বসের ফলে বা ভূমিকম্পের জন্য হয়তবা গড়িয়ে এসেছিল এখানে। অনায়াসে উঠে যাওয়া চলে তাদের ওপরে। সমস্ত নদী-নদীতট-গিরিখাত-জঙ্গল সেখান থেকে সুন্দর দৃশ্যমান। সকালের আলো মন্দাকিনীর জলের ওপরে পড়তে দেরি আছে এখনও; সূর্যদেবের পুবের পাহাড় পেরোতে পেরোতে বেলা গড়িয়ে যায় অনেকখানি। সেইসময় অনায়াসে যেন মনটা পিছিয়ে যায় অনেকদূরে - বহু দশক আগে এইরকম কোনও পাথরের ওপর বসে করবেট সাহেব বন্দুক হাতে অপেক্ষা করতেন সেই মানুষখেকো চিতাবাঘটির। বন আর নদীর শব্দ, সামনে বাঁধা মড়ি হিসাবে - একটি ভেড়া কিংবা ছাগল, তার ডাক অথবা পাতা চিবোনোর আওয়াজ ছাড়া আর কোনও সঙ্গী ছিল না তাঁর সেদিন। ভাবতে দোষ নেই যে কয়েক দশক আগেও কোনও এক সুন্দর সকালে এই পাথরের ওপর থেকে হয়তবা দেখা যেত একটা চিতা জলপান করতে এসেছে।

এইসব ভাবা যায় যতক্ষণ খুশি; যতক্ষণ না পরবর্তী গন্তব্যের তাড়া বিচলিত করে। সেটা কেদারনাথ হতে পারে বা বদরিনাথ। কিংবা তুঙ্গনাথের আশায় তিন ঘণ্টার দূরের চোপতাও।

পেশায় ইঞ্জিনিয়ার সৌম্য প্রতীক মুখোপাধ্যায় একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত। চাকরি সূত্রে দীর্ঘদিনের প্রবাসী বাঙালি। অল্প ক'দিনের ছুটি পেলেও বেরিয়ে পড়াই তাঁর নেশা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend